



বাংলাদেশ কথা কয়



বাংলাদেশ কথা কয়

সম্পাদক

আবদুল গাফফার চৌধুরী

মুদ্রাণ



প্রথম প্রকাশ (ভারতে) : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ ; নভেম্বর ১৯৭১
দ্বিতীয় প্রকাশ (বাংলাদেশে) : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ ; মে ১৯৭৪

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]

৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১

বাংলাদেশ ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :

দেবদাস চক্রবর্তী

ছেপেছেন :

শ্রীপ্রভাংশুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা—১

বাংলাদেশ ।

মূল্য নয় টাকা

BANGLADESH KATHA KAY

(Collection of stories)

Edited by Abdul Gaffar Chowdhury

MUKTADHARA

[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]

74 Farashgonj, Dacca—1

Price Taka 9'00

স্বদেশ-মুক্তির মন্ত্রে নির্ভয়
যাঁরা রণাঙ্গনে লড়ছেন—
মুক্তিযোদ্ধাদের
করকমলে

বাংলাদেশ কথা কয় : সম্পাদকের কথা

যুদ্ধ-সাহিত্যের সমাদর সব দেশেই রয়েছে। তার তাৎক্ষণিক প্রচার ও জনপ্রিয়তা ব্যাপক। যে-কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপরে লেখা এককালের জনপ্রিয় ইংরেজি বা রুশ উপন্যাসও আজ আর তেমন সমাদৃত নয়, ঠিক একই কারণে যুদ্ধ ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখা চল্লিশের বাংলা গল্প ও উপন্যাসও পাঠক-মনে আর তেমন রেখাপাত করে না।

যুদ্ধ ও বিপ্লব সব সময় সমার্থবোধক নয়। এজ্ঞেই গণ-বিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব ও গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি নিয়ে রচিত কোন কোন যুদ্ধ-সাহিত্য যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য। যে-কাহিনীতে কেবল যুদ্ধই মুখ্য নয়, যুদ্ধের পেছনের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিগন্ত বিস্তৃত, তা রসোত্তীর্ণ হলে যুগজয়ী সাহিত্যের ধ্রুপদী-চরিত্র লাভ করে—যেমন টলস্টয়ের ‘ওয়ার এণ্ড পীস’, এরেনবুর্গের ‘ফল্ অব পারি’। বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধও কেবল যুদ্ধ নয়, বরং গণ-বিপ্লবের চরিত্রযুক্ত যুদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এর রেখাপাত তাই বলিষ্ঠ ও ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সমাজ-মানস ও সাহিত্য-মানস কতটা গতিশীল, ক্রিয়াশীল এবং পরস্পরযুক্ত, তার প্রমাণ মিলবে ১৯৬০ সালে প্রথম ঢাকা থেকে ‘দাঙ্গাবিরোধী পাঁচটি গল্পের’ আত্মপ্রকাশে। পরবর্তী কালে ভাষা আন্দোলন থেকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় পর্যন্ত বাংলা-দেশের সাহিত্য নানাভাবে মোড় ফিরেছে, সযুদ্ধ হয়েছে, জন-মানসের প্রতিরোধ চেতনাকে বিস্তারলাভে আরো সাহায্য করেছে। বর্তমান জাতীয় মুক্তির যুদ্ধেও বাংলাদেশের গল্প ও কবিতার ভূমিকা তাই গৌণ নয়।

‘বাংলাদেশ কথা কয়’ গ্রন্থে সন্নিবেশিত বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণ ও প্রবীণ কথাশিল্পীর লেখা গল্পগুলো তাই নিছক যুদ্ধ-সাহিত্য নয়; বরং বাঙালী জাতীয়মানসের বর্তমান বিপ্লবী প্রতিরোধ চেতনার কয়েকটি রূপরেখা। এত কাছের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে লেখা গল্প সকল সময় গল্প হয়ে ওঠে না। কখনো কখনো প্রামাণ্য চিত্র হয়ে ওঠে। সুতরাং কোন পাঠক যদি এই গল্পগুলোর প্রত্যেকটিতে সার্থক গল্পের রস অথবা কুশলী হাতের স্ফট চরিত্র ও ঘটনা-সন্নিবেশ খোঁজেন, তাহলে নিরাশ হতেও পারেন। বাংলাদেশের সাহিত্য-মানসে বর্তমান জাতীয় বিপ্লবের প্রচণ্ড

বাত্যা ও তরঙ্গ থেমে গিয়ে যখন স্রষ্টির পলি জমবে, তখনই কেবল আশা করা যাবে, এই মহাবিপ্লবের কাহিনী নিয়ে লেখা সার্থক, রসোত্তীর্ণ এবং হয়তো বা যুগোত্তীর্ণ গল্প ও উপন্যাসের। বহমান ঘটনার প্রবল বাত্যা যখন থেমে যাবে, তখনই কেবল আমাদের লেখকরা পাবেন নিলিপ্ত দৃষ্টিশক্তি, নিরাসক্ত চিন্তার ক্ষমতা এবং খুঁজে পাবেন ঘটনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণের অনুদ্যাটিত সূত্র। তবু এখনও বাংলাদেশের লেখকেরা লিখছেন। তাতে রয়েছে, প্রবল আতি, ক্রোড, ক্রোধ, আশা-হতাশা ও উদ্দীপনার সাময়িক উত্তাপ এবং যন্ত্রণা।

‘বাংলাদেশ কথা কয়’—এই গল্পগ্রন্থে তাই সব গল্পই গল্প নয়। কোনটি যথার্থ সার্থক গল্প। কোনটি প্রামাণ্য চিত্র, কোনটি সমকালীন ঘটনার প্রচণ্ড উত্তাপ অথবা অন্তর্দাহ। কোথাও আশা উচ্চারিত। কোথাও নিঃশব্দ নৈরাশ্য প্রতিভাসিত। কোথাও যুগপৎ আশা-নিরাশা, আনন্দ ও বেদনা পাশাপাশি সমুচ্চারিত। বাংলাদেশের সমকালীন মন ও চরিত্রের, জাতীয় মুক্তির—বিপুলাবেগে প্রসারিত ঘটনাবলীর উচ্চারিত কণ্ঠ তাই—বাংলাদেশ কথা কয়। এই কথার সঙ্গে পরিচয় বর্তমান ঝঞ্ঝাটের বাংলাদেশের সঙ্গেই, হোক তাৎক্ষণিক—কিন্তু প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ পরিচয়।

২৫ কাতিক ১৩৭৮

আবতুল গাফ্ফার চৌধুরী

ডিকসন লেন, কলকাতা

সূচীপত্র

সাদা কফিন ॥	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	১
শেষ যাত্রা নয় ॥	নির্মলেন্দু ঙ্গ	১২
লাল পণ্টন ॥	আবদুল হাফিজ	২৫
বুলি তোমাকে লিখছি ॥	স্বরত বড়ুয়া	৩৬
চরিত্র ॥	ফজলুল হক	৪৯
রক্ত প্রজ্ঞা ॥	আসফ-উজ্জ-জামান	৬৭
সোলেমান ভাই ॥	বুলবন ওসমান	৬৪
নীল নক্শা ॥	কামাল মাহবুব	৭৯
শব্দ তাড়িত ॥	অনু ইসলাম	৯৩
কমলা রঙের রোদ ॥	আসাদ চৌধুরী	১০৭
পরিবানুর কাহিনী ॥	সত্যেন সেন	১১২
অতের ডায়েরি থেকে ॥	ইলিয়াস আহমদ	১২৭
সময়ের প্রয়োজনে ॥	জহির রায়হান	১৩৫
শেষ বাজি ॥	কায়েন আহমেদ	১৫২
আলোক অবেশা	শওকত ওসমান	১৫৭
রোদের অঙ্ককারে রঙ ॥	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	১৭০

স্বাদা কক্ষ

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

এতক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ ছিল সমগ্র শহর। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ তৈরী করা হয়েছে বলে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। খুব কচিৎ একটা সাইকেল-রিক্সা ঝড়ের বেগে ছুটে হয়তো বেরিয়ে গেল, শুধু বাতাস কাটা আর পীচের সঙ্গে ঢাকা ঘর্ষণের শব্দ, হয়তো রিক্সায় কিছু মালগত্র বোঝাই আছে কিংবা খালি, অথচ কখনো একটা গাড়ির দেখা নেই। মাইল, আধ-মাইল দূরে দূরে ইট, ড্রাম, ওন্টানো গাড়ি ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাতেই রাস্তায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। ছায়া ছায়া রাস্তা, বড়ো বড়ো মেহগিনি ও শিশু গাছ রাস্তাগুলোকে আরো নির্জন ও নিবিড় করে তুলেছে। জনমানবের গন্ধ নেই রাস্তায়। মনে হঠাৎ এমনও অবাস্তব প্রশ্ন জাগে, অবরোধ টিকবে তো? দূর থেকে সেই অবরোধ পাহারা দিচ্ছে মুক্তিবাহিনী।...বাক্সদের মুখে আগুন লাগল বলে! পরিবেশটা তেমনি বিস্ফোরণমুখী।

ভাতীয় সঙ্গীত না বাজিয়ে বেতারের তৃতীয় অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি ভয়াবহ মনে হ'লে হ'য়ে একটা রিক্সার কথা ভাবছি। গাড়ি তো পাওয়ার সুযোগ নেই, বাধা ডিঙিয়ে তবু কোনোমতে রিক্সাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে।—আমাকে অনেক দূরে, মতিঝিল

পেরিয়ে বাসাবো অদি যেতে হবে। অদূর হেঁটে যাওয়া, কিংবা হেঁটে যেতে ভয় করছে।

লোকগুলো সব মরে গেল না কি এক নিমেষে।

আমি অনবরত চিন্তা করছি হেঁটে যাওয়া যাবে কিনা। বন্ধু-বান্ধব সবাই আজ গেল কোথায়? প্রেস-ক্লাব কি বন্ধ? সেখানে যাবো কি না আবার দ্রুত ভেবে নিলাম। কয়েক মিনিট। কিন্তু যেন কয়েক লক্ষ সেকেন্ড ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। এই ভাবে যেন অনন্ত সময়ের হনন চলল; রাস্তার নিস্তব্ধতায়, ফুটো ফুটো আকাশে, নিরিবিলা এবং নীরব পত্রগুলো, রাস্তার অন্ধকার লাইটপোস্টে, গির্জার চূড়ার ক্রুশে, রাত্রিপাত হচ্ছে প্রবল বেগে; রাত্রিপাত হচ্ছে নিষ্ঠুর এবং চতুর শত্রুর মত নিরবচ্ছিন্ন এক যোগসাজসে।

গত দু'দিন কাজের চাপে বাসামুখো হতে পারি নি আমি, অফিসে রাত কাটিয়েছি, আজ একটা কিছু ঘটতে চলেছে এরকম ইঙ্গিত বেতার অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে আছে। এখন সেই নানান চিন্তার পর্বত-প্রমাণ এক বোঝা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসামুখো চলছি, সারি সারি ইমারত ফেলে, বন্ধ রেস্টোরান্ট, হাপি মটরিং ছবি, বাসে ওঠার কিউ—হাই কোর্ট ভবনকে মনে হচ্ছে রূপকথার হাজার-দুয়ারী রহস্যময় প্রাসাদ।

সহসা একটা সাইকেল-রিজা দ্রুতবেগে আমাকে কেটে চলে যাচ্ছে দেখে আমি চীৎকার করে তার পেছনে ধাওয়া করলাম। সে আরো বেগে, আরো দ্রুত ছুটল। কিন্তু আমায়-যে তাকে ধরতেই হবে! এভাবে আমাকে পাগলের মত ছুটতে দেখে সে কি ভেবে—হয়তো কিছু না ভেবেই—থামল। খবর : শহরে সৈন্ত নেমেছে সাব, সরে পড়ুন, এফুগি এদিকে এসে পড়বে। তাদের আছে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, আরো কত কি...

: বল কি? সৈন্ত নেমেছে? কোথায়? কতদূরে?—আমার মাথা গুলিয়ে গেল, এ কি হ'ল, এ যে আমি ভাবতে—তুমি কোন্‌দিকে যাবে ভাই, জলুদি আমাকে নিয়ে চল!

: পারব না সাব। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, পথে পথে বাধা, আপনাকে নিয়ে যাব কী করে। না, আমি নিতে পারব না—হাঁপাতে হাঁপাতে রিক্সাঅলা কথাগুলো বলে ফেলল।

বললাম : তুমি যেখানে যাও আমাকে নিয়ে চল, তোমার সঙ্গেই থাকব আমি। বাধা ডিঙিয়ে ছু'জনে রিক্সা টেনে নেব।—তোপখানা সড়ক, মতিঝিল, কমলাপুর ছাড়িয়ে বাসাবো...

এত সব কথা সংক্ষিপ্ততম সময়েই শেষ হয়েছে। রিক্সাঅলা আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কিংবা কল্পণাবশতই হোক, তুলে নিল; তখন আশ্চর্য তেজোদীপ্ত সেই অচেনা রিক্সাঅলার গামছাবাঁধা মাথাটি আমার সামনে এক দৃপ্ত বিজয়ীর মতো উন্নত এবং উদ্ভত। কিন্তু কদরূর গিয়েই বাধা। আর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে গাড়ির ঘর্ষর শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। তক্ষুণি সে রিক্সা ফেলে দৌড় দিল, আমার সঙ্গে একটা কথা বলা কিংবা একবার ফিরেও তাকাল না। নিশ্চল রিক্সা, অপসৃত রিক্সাঅলা, ভৌতিক শহর, সৈন্তগণ, নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য অট্টালিকা—প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করল। আমিও দৌড়ে প্রেস-ক্লাবের চত্বরে আশ্রয় নিলাম। ভরসা, সেখানে যদি কাউকে পাই! কিন্তু কোনো সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পর অনেক খোঁজাখুঁজিতে চেনা দারোয়ানকে পাওয়া গেল, কিন্তু কোনো খবরই সে দিতে পারল না, শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করল : আপনি কোথায় যাবেন? এখন তো কেউ নেই। দরজা খুলে দেব? বরং পালিয়ে যান...। কেউ-ই নেই! কিন্তু যাব কোথায়? গাড়ির অর্থাৎ সামরিক ট্রাক ইত্যাদির শব্দ একদম এগিয়ে আসছে, ঐ বুঝি দেখা যায়! যদি

বাংলাদেশ কথা কয়

আসেই—এখানে আশ্রয় নিলাম, পরে যা হবার হবে, আপাতত এখান থেকে নড়ছি না—বুকের ভিতর তুক তুক কম্পমান একট বল যেন অবিশ্রাম লাফাচ্ছে, অবিরাম একট নৌকা ঢেউ-এর আঘাতে কাঁপছে, কাঁপছে। আমার কি যেন হয়ে গেল, দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে কি যে বলে গেল কিছুই শুনি নি। আমার সামনে পেছনে একট মাত্র শব্দ শুনছি—আশ্রয়।

প্রেস-ক্লাবে সাময়িক আশ্রয় নেয়া ভাল মনে করলাম; রাস্তায় যে-কোনো সময় কিছু একটা ঘটে যাবে বলে আমার মন বারবার বলছে, তাই তার চেয়ে মাথা গুঁজবার একটু আশ্রয় চাই। আমি অন্ধকার দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবার আগেই ছটো মিলিটারি কনভয় শব্দ করে প্রেস-ক্লাবমুখে হয়ে থেমে গেল। আমি একটু মাত্র দেরি না করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ না করে সোজা দোতালায় উঠে গেলাম। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে হেডলাইটের তীব্র আলোতে রাস্তা দেখলাম। তোপখানা সড়ক। ধূ ধূ এবং ত্রিয়মাণ।

কনভয় ইউসিসের সামনে। সমস্ত এলাকাটা অন্ধকার, শুধু ইউসিস আর বি. আই. এস.-এর কয়েকটি আলো ছাড়া।

খট্ খট্ শব্দে কয়েকজন ক্রুর সৈন্য নামল। হাতে তাদের স্বয়ং-ক্রিয় মেশিনগান। ওরা খানিক ভেবে ইউসিস থেকে একটা তার নিয়ে রাস্তার লাইট-পোস্টের তারের সঙ্গে যোগ করে দিল। সমগ্র রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

সৈন্যদের গতিবিধি সন্ধানী। প্রেস-ক্লাবের দিকেই তাদের দৃষ্টি। তারপর ছটো বড়ো কনভয়। ট্যাঙ্ক...

বাপ্‌স্‌। এইবার সমস্ত গুলিয়ে দেবে। সমস্তই। আমি জানালা ছেড়ে ঘরের ভেতর চললাম, বিপদ ঘনিয়ে আসল ভেবে। চারদিকে

বিদ্যুটে অন্ধকার, অন্ধকার হাতড়িয়ে চেনা দেয়াল-দরজা ইত্যাদি অনুমান করে বাথরুমের দিকে পৌঁছার আগেই ছুনিয়া-কাঁপানো শব্দ হ'ল গুড়-গুড়-বুম্, বুম্ বুম্। পলকে একরাশ বাতাস তাড়িয়ে বালি-ইট-প্লাস্টারের গুঁড়োর ঝড় বয়ে গেল, সমস্ত ঘরটি কেঁপে রাত্রির নিস্তর্রতাকে আরেকবার ভেঙে চুরমার করে আবার শব্দহীনতায় উধাও হয়ে গেল। আর ভয়জড়ানো চোখের ফাঁকে দেখলাম উত্তরের দেয়াল ভেদ করে কামানের গোলা পূব দেয়ালে বাধা খেয়ে ছাদ ফুটো করে চলে গেছে। একটা বিরাট গহ্বর আমার পাশে মূর্তিমান হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমিও চোখ খুলে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। দুই কান রইল নতুন শব্দের অনাকাজ্জিত প্রত্যাশায়। পায়ের কাছে মেঝে জুপ, জঞ্জাল। অন্ধকারে অনুমান করলাম সমস্ত ঘরটির দৃশ্য, বৃকের ভেতর একটি একটি পাজির নরম হয়ে যাচ্ছে অনবরত, মাথার ভেতর কয়েটির খাঁজে খাঁজে শির শির করছে বোধ হ'ল। তাড়াতাড়ি আবার গোলাবর্ষণের আগে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচের তলায় নেমে যাওয়া ঠিক করলাম। নেমে যাচ্ছি। সিঁড়ির হাতল মাঝে মাঝে গেছে উড়ে; অন্ধকারে, ভয়ে ভয়ে, আন্দাজে, নামতে নামতে যেন পাতালে নেমে যাচ্ছি। আমি একা মৃত্যুর রাজ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়া একটি প্রাণী নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছি, আর সেই পুরীর দেয়াল, আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, লোহার শিক আমার শরীরে মৃত্যুর নিঃশ্বাস ফেলছে অবিশ্রাম। কাঁপা কাঁপা পায়ে যেন ঠাণ্ডা সাপের স্পর্শ চলছে অবিরাম, অন্ধকারে মৃত্যুর মহড়া শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ আগেই।

নেমে যেতে যেতে নীচের হলঘরে যখন পৌঁছালাম, দেখি খোলা দরজার সামনে সেই ছরস্তু এবং অগ্নিস্করা প্লাকার্ডগুলো ভূতের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। যে-সমস্ত ফেস্টুন দু'দিন আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যবহারের পর দরজার সামনে বারান্দায় দেয়ালের

বাংলাদেশ কথা কয়

সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত ফেস্টুনের মুতিমান বিভীষিকা আমার চোখে পড়ল। রাস্তার স্বল্পালোকে চোখে পড়ল—ছ'জন মানুষ একজন আহতকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, নীচে লেখা : আমার ভায়ের তাজা রক্তের বদলা আমি নেবই নেব—আমিও আমার লাশের ছবি দেখলাম। আরো কয়েকটি আছে, আমি সেই সব প্ল্যাকার্ড' সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবলাম। সরিয়ে নিলে সৈন্যদের চোখে পড়বে না, তারা এদিকে আসবে না, আমি বাঁচব—আমি বাঁচতে চাই, মৃত্যুর গুহা ছেড়ে আমাকে বাসাবো যেতেই হবে। আমার ভাবলাম, না, যেমন আছে তেমনটি থাক, কাজ নেই ঝামেলা করে, ওরা যদি দেখে ফেলে? বরং এখানে কেউ নেই ভেবে তারা চুকবে না, তা'হলে আমি নিরাপদ। এইভাবে কতোকণ কেটেছে জানি না, আমি শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অবিশ্রাম গোলার্ধের শব্দ, পণ্টন ময়দানের দিকে দূরে কোথায়—তারপর ভাবলাম কোন্ দিকে যাব, কোথায় একটা আশ্রয় মিলবে—একটা আশ্রয়, একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল করা বারণ হয়েছে, মৃত্যুর ডাক এত পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে, অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো একান্ত আপন করে ধরা যায়,—সেই একটুকু আশ্রয়। আমি আবার হাতড়ে দেখলাম, কোথায় যাওয়া যায়, আমি আরেকবার উন্টোসিধা ভেবে নিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেমন ভাবা যায়, চারদিকে গোলাগুলির শব্দে যেমন একজন মানুষ দ্রুত ভাবতে পারে—যার সামান্য একটা গুলি একজনের পক্ষে যথেষ্ট—সেই ছল'ভ ভাবনার মুহূর্তে, ছর্বল-তার অতল স্রোতে ডুবে স্বজন-বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি সঠিক (?) কর্মসূচী তৈরী করতে চেষ্টা করলাম। দশ রকম চিন্তা-ভাবনা নয়, তারপর একটা স্থির ভাবনা লাফিয়ে লাফিয়ে মস্তিষ্কে খেলা শুরু করে দিল : পেছনের দিকে সংলগ্ন বাথরুমে যাও, মাথা গুঁজে নিজেকে বাঁচাও। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো বড় চিন্তা নয়,

যুদ্ধনীতি, গণহত্যার চাটার কে মানল কে মানল না সেই ভাবনাও নয়, এমনকি সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও নয়, শুধু নিঃশব্দে বাঁচাও। একটি নির্নিমেষ ভাবনার, একটি স্থিরসিদ্ধান্তের পরও আমি ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ডগুলো টানতে গেলাম—অমনি গর্জন, তখুনি বুম্ বুম্ বুম্। মাথা নীচু করে ছ'কানে হাত দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেঝেতে, তারপর সন্তর্পণে প্লেগ রোগে আক্রান্ত ইতরের মতো টেনে টেনে একদম বাথরুমের দরজায়। বাম হাত ও কাঁধের নীচটায় কি যেন জ্বলে উঠল, সেই কথা সম্পূর্ণ ভাবার আগে সব চেয়ে জরুরী কর্মসূচীর মতো যা চোখে পড়ল—ছুটো গভীর এবং ব্যাপক গর্ত হাঁ করে আছে পশ্চিম দিকের দেয়ালে, অথ আরেকটি বাথরুমের খানিক পূর্বে। সেই গর্তের ওপারে এক অপার শূন্যতা হা হা করে নিঃশব্দ চীৎকার করছে, আমার পায়ের কাছে, পিঠে স্ফুটকি-চুন-বালির সাম্রাজ্য আধিপত্য বিস্তার করেছে, বাতাস বালকদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। হাতে কাঁধে কেমন যেন শির শির করে ঘাম দিচ্ছে, অন্ধকারে সারা দেহে এক তরল শ্রোত বয়ে চলেছে। নিম্নমুখী। মাটির দিকে ঘাম-রক্ত অনবরত ছুটছে, এখন মাটিই বেশি রক্তলোভী। সামনে চলছে এক নিঃশব্দ মিছিল, কোনো কথা নেই, প্রতিবাদহীন প্রেস-ক্লাব, অথদিকে সেক্রেটারিয়েট। চার দেয়াল করোটি বের করে নির্বাক—একেকটি ইট খসে মাটির তলায় জমা পড়েছে—কতোদিনে মহাস্থানগড় ও ময়নামতীতে রূপান্তরিত হবে...।...অনেকক্ষণ বাইরের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বুকের নীচে কলুই সক্রিয় করে, হাঁটু জোড়া টেনে উঠতে গেলাম। বাঁ হাত নিঃসাড়া। এতক্ষণ খেয়ালে আসে নি। দাঁড়ালাম। বাথরুমের দরজার কপাট উড়ে গেছে; অন্ধকারে আন্দাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সারলাম, কতক্ষণ আগে সেরেছিলাম মনে নেই, প্যাণ্টের যথাস্থানে ভেজা ভেজা লাগছে। এতক্ষণে ভালো করে খবর পেলাম আমি এখনো বেঁচে

বাংলাদেশ কথা কয়

আছি, শৌচাগারের গন্ধে একাত্মতা অনুভব করলাম, আগার-অয়ার প্রায় ভিজে গেছে। ডান হাত বুলিয়ে অনুভব করলাম বাম বাহুর কাপড় উড়ে গেছে, পিঠেও কাপড় নেই। চটচটে রক্তের ধার নীচে নেমে গেছে, কিন্তু মোটা গেঞ্জির কদরূর চুঁবয়েছে এই মুহূর্তে তা খতিয়ে দেখার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। তারপর সেই চিরপরিচিত অথচ নিঃসঙ্গ ঘর ছেড়ে পেছনের উঠোনে দাঁড়ালাম, কিন্তু গাছের নীচে এবং আড়ালে। ততক্ষণে কনভর এবং ট্যাক্স ঘর শব্দে বহুদূর চলে গেছে, আমি অত্যন্ত নরম এবং ভারি গলায় ডাকলাম : কুতুব।

কুতুব, প্রেস-ক্লাবের অত্যন্ত চেনা একজন দারোয়ান। আমার ডাক শুনে সেই ছায়াকার দিয়ে ছুটে এল। বলল : এঁয়া, আপনার গায়ে রক্ত!

: হঁ্যা, রক্ত। তাই তোমাকে ডাকছি। পারলে ব্যাণ্ডেজ-জাতীয় একটা কিছু দাও। বাঁধি। এক গ্লাস জল।

কুতুব এক দৌড়ে ছুটে গেল। দূরের একটা বাল্ব থেকে আলোর রেখা পাতার আড়াল ভেদ করে পায়ের কাছে আবছা ছড়িয়ে আছে; কুতুবকে দেখলাম উঠোনের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের থাকার ঘরে ঢুকতে। এক, তিন, পাঁচ, সাত মিনিট...। কুতুব আসে না। কুতুব সেই ঘর থেকে আর বেরোয় না। আমার ভয়; আমাকে এক অসম্ভব দুর্বল-করা ভাবনা চেপে ধরল, আমি কিছু ভাবতে পারার আগে বসে পড়লাম। রক্ত, পূর্বেকার সমস্ত ঘটনা একের পিঠে একে জড়ো হ'ল। পৃথিবীটা একবার প্রলয় দোলায় আমার সারা শরীরের ওপর ছমড়ে পড়ল। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে কুতুব এসে আমার কাঁধে হাত রেখে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। এক আঁজলা জল, হাতে ব্যাণ্ডেজ করে দিল

ডেটল দিয়ে, পিঠের ক্ষতেও লাগাল। আমি বসে বসে কুতুবের দিকে তাকালাম, কুতুব তাকাল। আমি তার হাত ধরে দাঁড়ালাম। বা হাত বিম ধরা, দুর্বল, অসাড়। কিন্তু পালানোর এই উপযুক্ত সময়, সৈন্যরা আবার আসতে পারে।

আমি ভাবনা-চিন্তা ফেলে, ভাবনা-চিন্তার চেয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে কোথায় থামলাম অন্ধকারে বোঝা গেল না। অনুমান, সেগুনবাগিচার কাছাকাছি আছি, কোনো গলিতে। সেগুনবাগিচায় আলী রেজা থাকে, শান্তিনগরে সুপ্রকাশ, চামেলিবাগে মালতী আর বায়েজিদ থাকে। আমি কার কাছে যাব? বাসাবো যাওয়া একান্তই প্রয়োজন। হাসান এখন কোথায় কার সঙ্গে আছে কে জানে? সেদিকে অবিশ্রাম বৃষ্টির ছাঁচে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, কামান কিংবা মর্টারের শব্দ অবিরাম শুনছি; একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যখানে আমি অবকাশহীন ভাবনায় ভাসছি—চতুর্দিকে আগুনের হল্কা, আকাশটা ফসাঁ হয়ে গেছে, পথঘাট পরিষ্কার দ্রষ্টব্য, স্বল্প-পরিচিত গলিও এখন চিনতে আর কষ্ট নেই। দিকে দিকে সৈন্যদের পরিষ্কার-করা রাস্তায় আবার অবরোধ তৈরী করা হচ্ছে। ক্ষিপ্ৰগতিতে। কতক দামাল ছেলে। বড় রাস্তা জনশূন্য।

সহসা বাতাসে সস্ত্রাস ছড়িয়ে আবার কনভয়গুলো এগিয়ে আসছে—দৃশ্যমান রাস্তা ফেলে তার আগেই আমি ছুটে গেলাম। এবার গিজ'ায় : প্রভু যীশু, তুমি যুগে যুগে যেমন ছুঃখীদের কোলে তুলে নিয়েছ; তুমি নিজেও একজন অত্যাচারিত, ছুঃখী, তুমি আমাকে তুলে নাও প্রভু। ক্রুশের একেবারে কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, গিজ'ার দরজায় বিরাট তালা বুলছে। হাসান, সুপ্রকাশ, রেজা, মালতী কিংবা কারো কাছে যাওয়া হ'ল না—প্রভু, আমাকে তুলে নাও। আবার ঝড়ের বেগে গোলা ছুটল, ইতিমধ্যে হাতের ব্যাণ্ডেজ চুঁইয়ে গেছে, পিঠের ক্ষতস্থান

বাংলাদেশ কথা কয়

ঘামে ভেজা ছপূরের স্বকের মতো থিক্‌থিকে হয়ে গেছে, কামানেশ গর্জনও সেই মুহূর্তে রাষ্ট্র করল নিজেকে, নিল'জের মতো। আরো কিছু শব্দ, ধুলো, বালি, ছাই শরীরে মেখে পাগলের মতো একটা ঘরে ঢুকলাম; বুঝ করে শব্দ হ'ল ছাদে। আমি হাট-করা দরজা বেয়ে ঘরে ঢুকলাম তার আগেই, একটা কাঠের পাটা স্পর্শ করলাম। সেই স্পর্শে হাত বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শরীরে প্রবেশ করতেই আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল, স্পর্শটি পরিচিত, একান্ত এবং মনে হ'ল আমার বহু শতাব্দীর পরিচিত বন্ধু। মালতী, জিদ, হাসান, গুণ-এর প্রবল পরাক্রান্ত বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ল। আরো নিবিড় করে ওদের বুকে টানলাম, বাইরে লক্ষ-কোটি রাউণ্ড গুলির সূচির ঝড় বইছে, টলছে ঢাকা শহর, বন্ধ, হৃদয়, এবং বাসাবোর একটি কক্ষের একটি কর্কশ কলিং বেল মিষ্টি সুরে অনবরত বাজছে; আমি আস্তে আস্তে ঐ কাঠের বাস্তের আরো কাছে গেলাম, নিবিড় হাত পাতলাম তার গায়ে। কোনো বঞ্চনা নেই, কোনোরকম প্রতিবাদ না করে কাঠের বাস্তটি আমাকে মায়াবী হাতছানি দিয়ে ডাকল, অন্ধকারে সেই আহ্বান সুরভিত হয়ে আমাকে বিহ্বল করে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরে ধীরে ঐ কাঠের বাস্তে চিৎপাত গুয়ে পড়লাম। লম্বমান। মসৃণ কাঠের ঠাণ্ডা স্পর্শে মনে হ'ল একটি কফিনে আমি গুয়ে আছি। তারপর নিবিড় এক অন্তর্ভূতির মতো কফিনের ঢাকনি মুহূর্তে সঙ্গীতের তালে তালে বন্ধ হয়ে গেল, নাকে লাগল হাজার বছরের প্রাচীন কোনো এক কাঠবাস্তের সুগন্ধ। গোলাপ আর চন্দনের মধুর সুগন্ধ অতিক্রম করে গেল পূর্বের গন্ধকে, যেমন এক বাগান থেকে অগ্নি ফুলের বাগানে প্রবেশ করলে হয়, আবার প্রাচীনকালের কোনো এক অজানা-অনামা গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন

করে দিতে লাগল—চারদিকে আর গোলা-বারুদ, যুদ্ধ, হত্যা, ধ্বংসের কোনো চিত্র নেই এবং শব্দও নেই। আছে অনুচ্চকিত মধুর শব্দ করা এক সঙ্গীত, মধুরতম সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইছে পৃথিবী : বালক বয়সের জয়ের আনন্দের মতো সমস্ত শরীর-মন পুলকিত, কৈশোরের স্বপ্নের মতো একটি একটি কুঁড়ি ফুল ফোটাতে ব্যস্ত, যৌবনের স্পর্শের মতো বিভোর এক ঘুম সমস্ত চৈতন্যকে প্রাণিত করে দিচ্ছে—একটি একটি মালতী তাকে চুমুতে চুমুতে খল খল করে ছুটে চলছে, একটি বকনদী গ্রাম চোখের স্রুক্ষে ফুলের স্রবাস ছড়িয়ে বুকে লুটিয়ে পড়ছে, ইছামতি নদীর স্বচ্ছ স্রোত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ধুয়ে দিচ্ছে সমস্ত শ্রানিমা। সেই মধুরতম সঙ্গীতের আবহে কয়েক শো সৈনিক সেই ঘরে ঢুকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে সাদা কফিনটি কাঁধে তুলে নিল।

সেই সাদা কফিনের মিছিল চলছে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ধরে। রাস্তার দু'পাশের সারিবদ্ধ অট্টালিকা-ইমারত আধুনিক স্থপতিবিদ্যায় নবরূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে, কখনো তিন দেয়ালে, আবার সমস্ত দেয়াল জুড়ে যেন বায়ুপ্রবাহের স্রবধানু-ষায়ী অসংখ্য ছোটো বড়ো ছিদ্র, কখনো চুড়োগুলো মস্তক না হয়ে খ্যাবড়া, কোথাও শুধু কয়েকটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান, ছাদহীন অট্টালিকা জ্যোৎস্না-রৌদ্রের অপরূপ স্বপ্নখেলায় বিভোর, কিছুক্ষণ পূর্বেকার মারমুখো মেশিনগান এবং কামানের মুখগুলো সাদা কফিনের সম্মানার্থে অবনত, সৈন্যরা অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু'পাশের অসংখ্য গাছ লাল লাল থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ছড়াচ্ছে। একটি ধবধবে রাত্রির নিস্তব্ধতা বেয়ে ভেসে চলছে একটি সাদা কফিন।

গোবিন্দচন্দ্র

নির্মলেন্দু গুণ

যারা যাত্রাপথের খবর নিতে গিয়েছিল রণজিৎ তাদের মধ্যে একজন। বারহাট্টা থেকে দশধার, বাউসি হয়ে আরো দশ মাইল পৰ্যন্ত ঘুরে এসেছে ওরা—ওরা মানে মাণিক, দীপক, রামেন্দু, সদর আলী, কাদির এবং রণজিৎ। কাল সকালে সবাই যে-পথে রওনা দেবে আগে থেকেই সে পথের হাল অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসার জন্তে ওরা গিয়েছিল সেই সন্ধ্যার দিকে—লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে, স্থানীয় লোকদের সাহায্য-সহানুভূতির কথা বলে ফিরতে ফিরতে তখন প্রায় শেষ রাত। বারহাট্টায় ফিরে এসে দেখল আশপাশের গ্রাম থেকে আরো অনেকেই এসে জড় হয়েছে রাতের অন্ধকারে। সাহাদের পাটের গুদাম, দোকানঘর, বাসার বারান্দাগুলো--সব জায়গায় কেবল লোক গিজগিজ করছে। ওরা ফিরতেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরল সব। ‘কি খবর নিয়ে এলেন’, ‘রাস্তা ভাল তো’, ‘আমরা কালকে রওনা দিতে পারব তো?’ অনাগত ভবিষ্যতের মুখে তখন আকাশ ফস’ হয়ে উঠছে। পূবদিকে লালচে অন্ধকার। এখনি যাত্রা শুরু করতে হবে—কাদির মিঞা তার গুদামঘরে গিয়ে একটা টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, ওর নিজস্ব গুণাপাণ্ডা ছিল, ওরা এগিয়ে এল। কন, ভাই সাব’—সবার মুখেই প্রতিজ্ঞার চিহ্ন—প্রতিশোধ স্পৃহায় উজ্জল হয়ে উঠল ওরা, ‘কন’ কি করতে অইবে?’

‘ওনেছি রাত্রেই নেত্রকোণায় মিলিটারিকে টেলিফোনে খবর দিয়েছে খালেক মৌলবী; সুতরাং এখানে আর দেরি করা চলবে না।’ কাদির মিঞার অক্ষম উত্তেজনা চোখের কোণে জল হয়ে তখন ছলছল করছিল। পকেট থেকে একটা বাকঝকে ছুরি সবার সামনে উন্মুক্ত করে কাদির মিঞা বলল—‘আমিও যাব, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, পথে লুটপাটের সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া আমি যতদূর খবর পেয়েছি বাজারের কেউ কেউ মেয়েদের উপর অত্যাচার করার প্লান করছে। ওঁরা সবকিছু ফেলে রেখে দেশ থেকে পালাচ্ছেন—পথের মধ্যে যদি কেউ ওদের উপর অত্যাচার করতে চায়, আল্লাহর কসম, আমরা জান থাকতে তা হতে দেব না।’

একটা ছোটখাট বক্তৃতার শেষে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল—‘চলুন, সবাই চলে আসুন, আর দেরি করা যাবে না। আসুন। যা হয় হবে।’

আসুন বলতেই পাঁচ-সাত শ সর্বস্বহীন মানুষ ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী, নববিবাহিত দম্পতি থেকে শুরু করে রোগী, খঞ্জ-বিকলাঙ্গ মানুষ যার যা ছিল তাই নিয়ে লাইন বেঁধে একের পর এক দাঁড়িয়ে গেল। রণজিৎ কাঁপছিল—চোখের ভিতর জলের ঢেউ, কিন্তু মুখের আদলে একটা তীব্র আশাবাদ। কিছুই হয়নি যেন, যারা তাকে শেষ কথা বলতে এসে কাঁধে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, সকলকেই রণজিৎ একটি কথাই বলেছে, ‘দেখবেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, আর আমরা তখন যেভাবে দল বেঁধে যাচ্ছি, সেভাবেই ফিরে আসব আবার।’

‘আমরা সবাই ফিরে আসব’ বলতেই সারাটা পথের পাশের গাছ থেকে রাত-জাগা পাখিগুলো আনন্দে চিকচিক করে উঠেছিল। আর সারা শরীরে একটা কালো চাদর জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে পেছনে পড়ে গিয়েছিল শিবানী। গতকাল সারা পথ বৃষ্টিতে ভিজে রাত্রে জ্বর এসেছিল তার। ভোরে রণজিৎ ফিরে এসে শিবানীকে

বাংলাদেশ কথা কর

আঁকড়ে ঘুমিয়ে থাকা শেষ সম্বলের টুকলা থেকে জাগিয়ে তুলতেই বুঝেছিল, শিবানীর গা স্বরে পুড়ছে।

ছুঁষ্ট লোক ভেবে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল শিবানী। কিন্তু দাদাকে দেখেই কেঁদে ফেলল। ‘মন্তোষের কোনো খবর পেলে, দাদা?’ ‘না’, রণজিৎ পারিবারিক কথাগুলো তুলতেই চায় নি, কিন্তু যতই বলা হোক, শিবানী কিছুতেই বাবা-ভাই-মামা-দিদিমাদের তুলতে পারছে না।

‘দিদিমাদের একটা খবর পাঠাতে পারলে ভাল হ’ত। বাবা বাড়ি থাকলে কি সুন্দর আমরা একসঙ্গে যেতে পারতাম, তাই না?’ প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে রণজিৎ জিজ্ঞেস করেছিল ‘বাণী কোথায় রে?’ পাশেই জ্যাঠামশাই-এর পিঠে মুখ রেখে শুয়ে থাকা বাণীকে দেখেও প্রশ্ন না করে উপায় ছিল না রণজিতের। কারণ, জামাল-পুরে যে ধরনের অত্যাচার হয়েছে তাতে লোকে যতই আশার কথা বলুক, রণজিৎ কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, তার বাবা নির্বিঘ্নে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালাতে পেরেছেন।

দলটি তখন মাইল দু’য়েক এগিয়ে গেছে। বাণী একটা ছোট্ট পোঁটলা-মাথায় অনেক আগে এগিয়ে গেছে। একটু হাঁটতে গেলেই পায়ে ফোঁস পড়ে যায় বলে শিবানীর সঙ্গে সঙ্গে রণজিৎকেও পেছনে পড়তে হয়েছে।

আর এই পেছনে পড়তেই হাজার হাজার চিন্তা অজস্র স্মৃতি এসে চোখের সামনে হাজির হচ্ছে তার।

সামনে একটা নদী। নদীর কাছেই সবাই গিয়ে দাঁড়াল। কাদির মিঞা, মাণিক; সদর, রণজিৎ, রামেন্দু, দীপক নিজেদের ছ’ভাগে ভাগ করে তখন আগে-পেছনে চলে গেল, আর মাঝখানে থাকল সব

মেয়ে। ছোট নৌকা, চার-পাঁচ জনের বেশী লোক উঠলেই অভিমানে লজ্জায় জলে ডুব দিতে চায় যেন। ফলে নৌকো দিয়ে নদী পার হতে হতেই বেলা দশটা বেজে গেছে তখন—অথচ সন্ধ্যার আগে আগেই কলমাকান্দা পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে চলবে না। লুঠেরা দস্যুরা পথে পথে দল বেঁধে অপেক্ষা করছে সুযোগের—পেছনে সংখ্যায় কম হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাউসি পৌঁছতেই সীমান্তমুখী আরো এক দলের সঙ্গে মিলে ওদের দলে লোকসংখ্যা প্রায় হাজার ছাড়িয়ে গেল, তখনো আশপাশের গ্রাম থেকে লোক এসে মিলছে বাস্তুত্যাগীদের দলে।

সূর্য তখন মাথার উপরে সোজাসুজি আলো দিচ্ছে। ছপুরের ঘড়িতে একটার কাছাকাছি। অনেক নির্দেশ-সঙ্গেও মানুষগুলো ক্রমশ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেতে থাকল।

সবার পেছনে থাকল রণজিৎ, মাণিক, দীপক ছাড়াও কাদিরের সান্দোপাদদের ছ'চার জন। ছপুরের রোদ, পথ হাঁটার ক্লান্তি, পেছনে ফেলে রেখে আসা সারাজীবনের স্মৃতি-সম্পদ, সামনের উষর ভাঙা কঠিন পথের অজানা ভবিষ্যৎ—সবকিছু মিলিয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়া, কেউ কেউ গাছের ছায়ায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিতে গিয়ে সরাসরি ঘুমে ঢলে পড়েছেন। ওরা পেছন থেকে এদের জাগিয়ে, ওদের বোঝা যতদূর সম্ভব বহন করে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখা গেল, শিবানী, বাণী, কাদির প্রভৃতির সঙ্গে তাদের দূরত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে আধ মাইল এক মাইল থেকে গিয়ে পুরো দশধার থেকে খঙ্কি-রানীগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল। রণজিৎ ইচ্ছে করলে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারত; কেননা, ওরা যতই এগিয়ে যাচ্ছিল ততই পথের ভয় দূর হয়ে যাচ্ছিল। দশধার এসে শুনল স্থানীয় লোকরা ছোটো লুঠেরাকে ধরে সোজা পাঁঠাবলি দিয়ে কংশে ভাসিয়ে দিয়েছে, ফলে পথে আর ভয় নেই। রণজিৎ নিশ্চিত হয়েছিল—কিন্তু শিবানী,

বাংলাদেশ কথা কয়

জ্যাঠামশাই, বাণী, রামেন্দু কাদির ওদেরকে ধরার জন্য তাড়াহুড়া করে নি আর ।

বাড়ির ঘর, বাড়ির সামনের মাঠ, বাগান তার চোখে আবছা আবছা ছায়া দিয়ে যেতে থাকল রৌদ্রে । তার বাবা, ঢাকার চাকুরে ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ—সামনের অনিশ্চিত উন্মুক্ত আকাশ, মাটির পথ, ভারতবর্ষ, পাহাড়ের সীমান্ত সবকিছু তার কাছে মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো মনে হয় । কিন্তু কোন দুঃখ, কোনো স্বপ্নেই সে দীর্ঘস্থায়ী হয় না, ফিরে আসে । ছপুরের খর রৌদ্রেও একটার পর একটা সিগারেটে আগুন ধরায় । সবগুলো মানুষকে মনে হয়, সে নিজে—সবগুলো বৃদ্ধাকে তার মৃত মায়ের মতো মনে হয়, সব বুড়োমানুষগুলোই যেন তার বাবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আবছা মুখচ্ছবি । সব মেয়েগুলোই শিবানী-বাণীর মতো তারই মুখাপেক্ষী হয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে যেন পথে নেমে এসেছে । সবারই পেছনে বাংলাদেশ, সামনে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতবর্ষ—পাহাড়ের সবুজ সীমান্ত অতিক্রম করে রিকুজী ক্যাম্প বংরা, বাসমাঝা হয়ে আসাম । আসাম থেকে ধুবড়ি হয়ে ফারাক্কা—উত্তরবাংলা, কী দীর্ঘ পথ, হাজার হাজার মাইল হয়ে কলকাতায় তার মামা অসিত চৌধুরী । বেঁচে থাকলে তার বাবা যেখানে গিয়ে উঠবেন ।

রুগজিৎ আক্বাসকে সিগারেট দিল । সিগারেট নিতে গিয়ে হঠাৎ বিবেকে বাঁধল আক্বাসের—দেশ ছেড়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রুগজিতের সিগারেট খেতে বাঁধল আক্বাসের । অথচ হাতটা ততক্ষণে সিগারেটের কাছাকাছি চলে এসেছে । রুগজিৎ বুঝতে পারল আক্বাসের শক্ত হাতের ও মুখের পেশীগুলো প্রতিবাদে শক্ত হয়ে উঠে কি কথা বলতে চাইছে । রুগজিতের দেয়া একটি সিগারেটের বিনিময়ে যেন মানুষ খুন করতে পারে আক্বাস । ‘বাইন বাবু, ছনবেন, আপনেরারে’ যারা খেদাইল তারা বেশী দিন

বাঁচতে পারব না। খালেক মৌলবী...একটা অগ্নীল গাল মুখ থেকে ছুটে এসেছিল আক্বাসের, ফিরিয়ে নিয়ে বলল—‘ভাশটা স্বাধীন অইব তো বাবু!’ একবার রণজিৎ ভেবেছিল বলবে, ‘হবে না’ কিন্তু আক্বাসের উদ্বেজনাকে অস্বীকার করার সাহস ছিল না রণজিতের। বলল, ‘নিশ্চই, নিশ্চই।’

আরো কাছে এগিয়ে এসে আক্বাস বলল, ‘বাবু, আমি মুক্তি-বাহিনীতে যাইমু। আপনারা তো বংরা ক্যাম্পে থাকবেন, যান, আমিও চইলা আইতাছি।’ আক্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রণজিৎ, দীপক, মাণিক, কলিম সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিল—জয় বাংলা।

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা নামছে। চওড়া পথের দু পাশে গ্রামের কৃষকরা বোরো ধানের ক্ষেত থেকে ধান কেটে এনে জড়ো করছে। ভাষার মত ধান মাড়াচ্ছে গরু দিয়ে। চোখের সামনেই পাহাড় স্পষ্ট হচ্ছে—আগের মত নীল নয়, কেমন কালো শাদায় মেশানো। সেই ছোটবেলা থেকে রেলগাড়িতে নেত্রকোণা যেতে উত্তরের গারোপাহাড় কি সুন্দর নীল শাড়ির মতো আকাশময় উড়তে থাকত দূর থেকে দেখা এই পাহাড় অতিক্রম করেই একদিন তার জীবন বাঁচাতে হবে, দেশ ছাড়তে হবে, রণজিৎ কল্পনাও করতে পারে নি। অথচ আজ কত মানুষ দল বেঁধে কত দ্রুত পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে বাতাস এসে যেন জড়িয়ে ধরতে লাগল রণজিৎকে। এখানকার মানুষগুলো কেমন আলাদা—কোনো বিপর্যয়ই যেন স্পর্শ করতে পারে না এদের। ওরা দিবি ধান মাড়াচ্ছে গান গাইছে। একদিন রেলস্টেশনের অনেক দূরে ছিল বলে যাদের আমরা ঘৃণা করতাম তারাই আজ সুখে আছে, তারাই সুখে আছে। রণজিতের একেবারে মনে হয় স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ কথা কয়

কিংবা পরাধীনতা কেনোটাই যেন সীমান্তবর্তী এই সব মানুষদের স্পর্শ করতে পারে না। ছোট পথ, ভাঙা পুল, নদী-জঙ্গলে ভরপুর বলে ইয়াহিয়ার সৈন্তরা এত দূর কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না হয়তো। লুঠতরাজের ভয় না থাকলে এখানে কোথাও নিশ্চয়ই থাকা যেত।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে সামনে শেষ নদী, কংস পার হলেই কমলাকান্দায় একরাত সম্পূর্ণ নিশ্চিত বিশ্রাম সেরে কাল সকাল সকাল আবার সীমান্তমুখী যাত্রা শুরু হবে সবগুলো মানুষের। সবাই তখন নদী পার হয়ে গেছে—নদীর কাছে গিয়ে ওরা সব শেষে যখন পৌঁছল, রণজিৎ দেখল তার জ্যাঠামশাই অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছেন নদীর ধারে। শিবানী বাতাস করছে একটা তালপাতার পাখা দিয়ে কাদির নদী থেকে ডেকটি দিয়েই জল তুলছে আর বাগী চোখে একরাশ জল নিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছে।

রণজিৎ ডাকল—জ্যাঠামশাই। উত্তর নেই। শিবানীও কোনো কথা বলল না। কাদির আশ্বাস রণজিৎ ধরাধরি করে আজীবন অকৃতদার বৃদ্ধকে নৌকায় তুলল।

হঠাৎ করে অসুস্থ না হয়ে পড়লে কথা ছিল। কাদির আশ্বাস সদর...যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল তারা ফিরে যাবে। দশধারের মজুমদার বাড়িতে রাত কাটিয়ে কাল সকাল সকাল ফিরে যাবে বারহাট্টায়। যারা কাদিরকে ছাড়া বারহাট্টা থেকে পা-বাড়াতে সাহস করে নি, নদী পার হয়ে তারা আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে নি ওকে, অবশ্য এজন্তে ওর মনে কোনো ফোভ ছিল না। কিন্তু চোখে লেগেছিল রণজিতের। কাদির রণজিতের বাল্য-কালীন বন্ধু। ম্যাট্রিক পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছে।

ছোট থানা শহর কমলাকান্দায় হোটেলে খেয়ে দেয়ে অন্য সবাই ফিরে গেলেও কাদির ফিরল না। কাদিরের সঙ্গে থাকল আশ্বাস। যে যেখানে জায়গা পেয়েছে স্কুলে, কালীবাড়িতে দোকানের

বারান্দার মানুষের ফেলে যাওয়া খালি উদাম ঘরে রাত্রির মতো স্থান করে নিল সবাই।

কিন্তু জ্যাঠামশাইর জ্ঞান ফিরল না। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় সুবোধ বিশ্বাস বলে এক ভদ্রলোকের খালি বাসায় রাত কাটাবার অনুমতি পেল ওরা। পাশে কোথাও ডাক্তার নেই, ডাক্তার বলতে এ অঞ্চলে ছিলেন সুবোধ বিশ্বাস—মাত্র গতকাল ওঁরা সপরিবারে সীমান্ত পার হয়েছেন। হঠাৎ করে এই ছোট বাজারে এতগুলো লোক আসতে দোকান-পাটের খাচসামগ্রী ছ ছ করে বিক্রি হয়ে গেল চড়া দামে। গত রাত্রে সব কিছু চিড়া-কলা-মুড়ি এবং জল ছাড়া কিছুই খাওয়া হয় নি এদের। বাজার থেকে কলা, গুড় ও চিড়া নিয়ে এল কাদির। অন্য সবাই যা কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে কালকের যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে। শিবানীর চোখ দু'টো বুজে আসছিল ঘুমে—অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাণী অনেক আগেই জ্যাঠার পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

শিবানী'

মুখ তুলে চাইল শিবানী, কথা বলতে ঠোট কাঁপছে তার। দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে।

'আপনি কেন কষ্ট করছেন আমাদের জন্য?'

'কষ্ট নয় শিবানী, প্রায়শ্চিত্ত করছি। যাদের জন্য তোমরা আজ দেশ ছাড়ছ তাদের জন্যেই, তাদের লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাদের।'

কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল কাদিরের। তার হঠাৎ মনে হ'ল জীবনের এই মুহূর্তটার মূল্য অনেক বেশী—সমস্ত সমস্যা,

বাংলাদেশ কথা কয়

বাংলাদেশ, স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমান পৃথিবীর সব সমস্যা থেকেই
এ মুহূর্তটি আলাদা, এ মুহূর্তটি অন্তরকম।

আর এই অন্তরকম মুহূর্তেই ডাক্তার না পেয়ে রণজিৎ আর
আব্বাস ফিরে এসে দেখল, শিবানী আর কাদির অনেক
কাছাকাছি চোখের জল দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসছে।
জ্যাঠামশাই ঘুমুচ্ছেন, বুকের হাড়গুলো সামান্য আলোর মধ্যে
উঠছে-নামছে। পাশেই বাণী—যেন জ্যাঠামশাইর সমানবয়সী
হয়ে গেছে হঠাৎ।

সারারাত কারোরই প্রায় ঘুম হয় নি। ভোরের দিকে রামেন্দু,
দীপক, মাণিক ওরা ডাকতে এসেছিল। ওরা ভোর পাঁচটায়
হঠাৎ বাজার কাঁপিয়ে রওনা দিল। কিন্তু রণজিতের যাওয়া হ'ল
না। এখান থেকে বড়ার মাইল সাতেক, কিন্তু সীমান্ত পার হলেই
তো চলবে না, যেতে হবে যেখানে ক্যাম্প সেই পর্যন্ত, তবেই
সাময়িক বিশ্রাম। যাবার সময় সবাই বলে গিয়েছিল, ভয় নেই,
কুলি ঠিক করে চাং বেঁধে নিয়ে এস; আমরা যাচ্ছি। ভয় নেই।
স্থানীয় লোকরাও বলেছিল ভয় নেই—একটু স্তব্ধ হয়েই যান।
এদিকে লুট-পাট করতে যাবে না কেউ, তা'ছাড়া মিলিটারি এখান
থেকে দশ মাইল দূরে লেঙ্গুরায়, আপনারা সোজা চলে যাবেন
এলং বাজার হয়ে মহাদেও। আজকে থাকুন—কালকে কুলি
পাবেন, কালকে বাজার যার।

সকাল হলে আব্বাস থাকবে না কিছুতেই—রণজিৎ কাদিরকেও
চলে যেতে বলল। কিন্তু শিবানীর অব্যক্ত চাউনির মধ্যে কি খুঁজে
পেয়েছিল কাদির কে জানে। সীমান্ত অতিক্রম করে না দিয়ে সে
কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না।

‘তুই যা, আমি কাল ফিরব। আব্বাকে বলিস্ আমার জন্তে ভয়
নেই—এই-যে ছোরা’ বলে কোমরে রক্ষিত সেই ঝকঝকে

ছোরাটায় হাত বুলিয়ে কোনো অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করল কাদির, 'একদিন তো মরবই কিন্তু মেরে মরব। যা হয় হবে।' এই 'মেরে মরব' প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ দলের লোকসংখ্যা চিরকাল কম থাকে। একত্রেও সবশেষে থাকল কাদির—এই মেরে মরার দলের একমাত্র সদস্য। 'তুই যা, আমার জন্তে ভয় নেই।

আশ্বাস তখনও নদী পেরোয় নি। জ্যাঠামশাই চোখ খুললেন ঘরের চাল ছুঁয়ে যাওয়া একটা হেলিকপ্টারের ভীষণ আওয়াজে। লোকজনের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। নদীর মাঠের দিক থেকে মিলিটারী আসছে বাজারের দিকে। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস হয় নি ওদের। কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যেই শুরু হ'ল গুলী। ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে রণজিৎ, কাদির, শিবানী, বাণী জ্যাঠানশাইকে আগলে বসে থাকল।

পালিয়ে যাবার পথ নেই। চারিদিক থেকেই মিলিটারির গুলীর আওয়াজ ভেসে আসছে—একটু নিঃশব্দ হলেই মানুষের ক্রন্দনধ্বনি, হয়তো ইতিমধ্যেই অনেক জীবন নাশ হয়েছে। কাদির বলল, ওদের সঙ্গে শান্তি কমিটির লোক আছে, ওরা দেখিয়ে দেবে—জ্যাঠামশাইর কথা বলতে ঠোট শরীর কাঁপছিল। সব কথা বোঝা গেল না, তাঁর হাত নাড়া থেকে স্পষ্ট আন্দাজ করা গেল শুধু তিনি পালিয়ে যেতে বলছেন, যে-স্টেশনে অ্যাকসিডেন্ট হবে তার আগের স্টেশনেও ভাগ্যহীন গাড়' যেমন কিছু না জেনে সবুজ পতাকা নেড়ে ট্রেনটাকে চলে যেতে বলে তেমনি। হয়তো নিজের চোখে এ অবশ্যস্তাবী অত্যাচার দেখতে চান নি তিনি। কাদির আশা দিল, ভয় নেই, মারলে সবাইকে মারবে। কিন্তু তোর যে বিয়ে হয় নি একথা বলবি না। মিলিটারিগুলো তখন পাশের ঘরে দরোজায় লাথি দিল। দরোজার ফোকর দিয়ে রণজিৎ লক্ষ্য করল ওদের সঙ্গে কেউ নেই, যে চিনিয়ে দিতে পারবে। স্মৃতরাং

...লাথি দিয়ে দরোজা ভাঙতে হ'ল না, নিজের হাতেই খুলে দিল
রণজিৎ। জ্যাঠামশাই এই-যে চোখ বুজলেন আর চাইলেন না।
ইচ্ছে করেই হয়তো মৃত্যুর ভাণ করে থাকলেন। অথবা মৃত্যুই
জীবনের ভাণ করে থাকল।

কাদির বলল, 'স্যার, আমরা খাঁটি পাকিস্তানী.....হাম ডাক্তারী
করতা, ইয়ে রোগী দেখেনেকে লিয়ে ইধার আতা হায়া।' শিবানী
তখন জ্যাঠামশাইর মৃতদেহেই পাখা দিয়ে বাতাস করছিল। একটা
মিলিটারি এগিয়ে এসে শিবানীর হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে
পাশের কোঠায় নিয়ে গেল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ করার আগে শিবানী
বলল, আমার বাচ্চা আছে পেটে, আমি মরে যাব।

রণজিৎ স্পষ্ট শুনল মিলিটারিটা শিবানীর শরীর সন্তোকে পরম
তৃপ্ত হয়েও উচ্চারণ করল, 'বাস্টাড'। অফুরন্ত সময় তার ক্রুদ্ধ
ভয়াল অশ্লীল হাতের ছাপ এঁকে দিয়ে প্রতিবাদহীন হয়ে যেতে
থাকল। রণজিৎ বাইরে দাঁড়ানো একজন মিলিটারিকে বলল,
'স্যার, আমরা হিন্দু হ সাকতা লেকিন কুই ইণ্ডিয়া নেহি যাতা—
হামলোগ্ টু পাকিস্তানী।' রণজিৎকে দেখতে একটু বয়স্ক মনে
হয়, গালে দাড়ি, ভাঙা গোয়াল সহজেই বয়স ইচ্ছেমত বাড়ানো
কমানো যায়। রণজিৎ বলল, 'আমার বয়স চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ
হবে স্যার—'

পাশেই একটা বাড়িতে আগুন জ্বলছিল, শিবানীর শরীরময় যেমন
একবার সে ভেবেছিল ঐ বাড়িতে গিয়ে ঝাঁপ দেবে। চার-পাঁচটা
মিলিটারি তখন ঘরে ঢুকল। ইচ্ছে করেই শরীরে, গালে, স্তনে
ভেজা মাটি এবং তামাকের লালি মেখে কোঠা থেকে অপরিষ্কার
হয়ে বেরিয়ে এল শিবানী—তলপেটে হাত রেখে শিবানী বলল,
'আমার বাচ্চাটা মরে যাবে। আমি মরে যাব।' রণজিৎ দেখল,
শিবানীকে তবুও সুন্দর দেখাচ্ছে—শিবানীকে হয়তো বাঁচানো
যাবে না। রণজিৎ বলল, স্যার 'আমার বিবি', 'বিবি' শব্দটা

বারবার অপবিত্র প্রতিধ্বনি করে ঘরময় ফিরতে লাগল অনেকক্ষণ। একটু পাগল, একবার ভীষণ অসুখে পড়েছিল, স্যার হামারা টু, পাকিস্তানী...জ্যাঠামশাইর এই অন্তিম নিজাকে অবজ্ঞা ভেবে একটা বাকবাকে বেয়নেট তাঁর বুকে ঢুকিয়ে দিল—‘উঠ শালা, বাস্টাড’...’ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল একরাশ রক্ত। একজন বলল, ‘শালা ডেড।’

ঘরময় শুরু হ’ল সার্চ, আর সার্চ করতে গিয়েই কাদিরের কোমর থেকে আবিষ্কৃত হ’ল বাকবাকে ছোরা। হঠাৎ যেন একটা সন্দেহের ছায়া খেলে গেল সবাই চোখেই। পরস্পরের দিকে তাকাল সবাই। রণজিৎ দেখল, শিবানী জ্যাঠামশাইর রক্ত দিয়ে চুলের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। বাণীর মুখটা ফোঁটা ফোঁটা রক্তের চন্দনে সাজানো। চোঁকির পা বেয়ে রক্ত নেমে আসছে মেঝেয়—মেঝে থেকে ঢালু বারান্দা হয়ে এই রক্ত কংসে যাবে, কংস হয়ে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে সেই রক্ত। ওরা জোর করে ধরে চ্যাংদোলা করে কাদিরকে একটা মিলিটারি জিপে ওঠাল।

‘শালা মুক্তিফৌজের লোক’—একজন মিলিটারি উচ্চারণ করল আরেক জনের কানে। সবাই বুঝল, কাদিরকে বড়জোর নদীতে নিয়েই মেরে ভাসিয়ে দেবে। গাড়িটা কাদিরকে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কাদির পেছন ফিরে তাকাতে পারল না, তার চারিদিকে চীনা মেড লাইট মেশিনগানের উদ্ভত ব্যারেল।

যতদূর দেখা গেল রণজিৎ, শিবানী আর বাণী ততক্ষণ নড়ল না নড়তে পারল না। শিবানী দেখল, রণজিৎের চোখ ছুঁটো কি ভীষণ লাল টকটকে, রাতারাতি পঁচিশ বছরের রণজিৎ যেন সত্যি সত্যিই চল্লিশের প্রৌঢ়, শিবানীর সত্যি সত্যি স্বামী, দাদার দিকে মুখ তুলতেই পারছে না সে, রণজিৎও চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে—দোষটা কার? কার অক্ষমতার জন্তু এমন হ’ল? পরমুহূর্তেই কিছুই হয় নি যেন এভাবেই বলল রণজিৎ, ‘মুখটা ধুয়ে ফ্যাল শিবানী’;

তাকে চেনাই যায় না। শিবানী তখন ঘর উঠে এল, দাঁড়াল জ্যাঠামশাইর পাশে, বুকের যে-কত দিয়ে রক্ত বারছিল তাতে চাপ দিতেই এক বালক রক্ত বেরিয়ে এল, হাতের তালুতে নিয়ে শিবানী সেই রক্তমাখা হাতে ভাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল, তারপর পরম আদরে তার কল্পিত হাতের রক্ত মাখিয়ে দিল রণজিতের গালে-কপালে চোখে, সম্পূর্ণ মুখটাই তখন লাল সূর্য। শিবানী বলল, 'দাদা' তোকেও চেনা যায় না রে। আমরা এখন আর মানুষ নই।' রণজিৎ কোন কথাই বলতে পারল না। শুধু জ্যাঠামশাইর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল শেষবারের মতো। দিনের আলো সামনে নিয়েও যে-পাহাড়ের পথে মানুষ পা বাড়ায় না, শিবানী বাণীকে নিয়ে রণজিৎ সেই পাহাড়ের দিকেই রওনা দিল সারারাত্রির অন্ধকার সামনে নিয়ে।

ফুলবানু

—আবদুল হাফিজ

ফুলবানুকে ও দেখে, প্রাণভরে দেখে। কেমন একটা ফুলের মতন মেয়ে। বুকে চেপে ধরলে মনে হয় ফুলবানু বুঝি বুকের ভেতরটায় ঢুকে পড়বে। ফুলবানুও কেমন যেন স্বেচ্ছা বুদ্ধি বুদ্ধি শরীরটাকে একেবারে ছেড়ে দেয়, এলোমেলো হয়ে যায়। কদম আলী ছ'চোখ বন্ধ করলে সব দেখতে পায়। ফুলবানু চোখ বন্ধ করে থাকে, ভাল-বাসা ওকে এতটুকু করে দেয়, আরো নরম আরো পেলব করে দেয়। কোথা দিয়ে যে কী হয়, ফুলবানু বুঝতে পারে না। কদম আলী অনুভব করে। ফুলবানু প্রেমের স্তব্ধ কথো কয় না। মুখ তুলে না। বুকের ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে একেবারে নিশ্চুপ থাকে। একদিন ও বলে, ফুলবানু, গরীবের ঘরে তাকে মানায় না, বুঝলি, একেবারে মানায় না।

ফুলবানু ওর মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, ওসব বলতে নেই। কদম আলী মাঝে মাঝে ভাবে, মেয়ে মানুষ জাতটাই কি এমন হয়, না কি ফুলবানুই শুধু আলাদা।

কদম আলী সত্যি সত্যি বুঝতে পারে না ফুলবানুর ব্যবহার। কিছু চায় না মেয়েটা। বাড়িতে যে একটা মেয়ে আছে—তা বোঝবার মতো উপায় থাকে না। চুপচাপ, নিরীক্ষা। কারো বাড়ি যায় না।

বাংলাদেশ কথা কয়

যেন আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। একদিন শুধু বলেছিল—তুমি
আছ, আর আমার কিছু চাওয়ার নেই।

কদম আলী বলত—তাই বুঝি, আমি থাকলে তোমার আর কিছু
চাওয়ার নেই।

‘না গো না’ বলে ওর বুকে মুখ গুঁজতে থাকে, যেন একেবারে
ভেতরে সঁধিয়ে যাবে।

একদিন কদম আলী দেরী করে ফিরেছিল। কারখানায় গিয়েই
দেখে মিছিল চলেছে ঢাকার দিকে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী
আশরাফ ভাই দেখেই হো হো করে হেসে বলল, নতুন বৌ কিনা,
তাই। কদম আলী লজ্জা পেল দেরী করে আসবার জন্তে। ওর
বন্ধুরাও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ল না। কেউ বলে, শুধু কি নতুন বৌ,
তায় আবার সুন্দরী। কেউ বলল—নতুন নতুন ওরকম হয়েই থাকে।
লজ্জা করো না কদম ভাই। কদম বুঝতে পারে ওর বৌ-ভাগ্যে
সবার হিংসে হচ্ছে। ওর চোখেমুখে লজ্জার ভাব থাকলেও মনে
মনে ও খুশিই হ’ল।

মিছিল ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে। বিরাট একটা সর্পিল মিছিল।
এঁকে বেঁকে চলেছে। এ-মাথা থেকে মিছিলের ও মাথাটা চোখে
পড়ে না। মাঝপথে এসে দেখে আর একটা মিছিল চলেছে। সবার
হাতে নৌকোর বৈঠা। মাঝিরা মিছিল করেছে এই প্রথম। দুই
মিছিল এক হ’ল। ঘন ঘন শ্লোগান উঠল। মাথার ওপর সূর্যের
তখন দারুণ উত্তাপ। শরীরের ভেতর রক্ত টগবগ করছে। কদম আলী
নিজের অজান্তেই চীৎকার করে উঠল—কৃষক—শ্রমিক অস্ত্র ধর—
মিছিলের জনতা গর্জন তুলে উত্তর দিল—বাংলাদেশকে মুক্ত কর।
মিছিল এগোয় আর কদম আলীও উত্তেজিত হতে থাকে। তার
অজান্তেই সে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে থাকে। ভাইসব, আদমজী,
দাউদ, ইম্পাহানী আমাদের শত্রু। পাকিস্তানের বাইশ পরিবার

সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে। তাই প্রতিশোধ নিতে হবে।
কদম আলী পরক্ষণেই ভাবে, সে তো কোনদিন বক্তৃতা দেয় নি।
তবে আজ সে ভাষা পেল কোথায়? এমনি ভাবতে ভাবতে সে
চলেছে। মিছিলও এগোচ্ছে টিমে তেতালায়। কত দিক থেকে
কত-যে মিছিল এল তার হিসেব নেই। কারো ঘাড়ে লাঙল, কাঁধে
কোদাল কারো হাতে বৈঠা—কারো হাতে শুধু লাঠি। এতবড়
মিছিল সে দেখেছে নাকি কখনো? এমন সময়ে তার কাঁধে কে যেন
হাত রাখল পেছন থেকে। ফিরে দেখে আশরাফ ভাই।

সাধাম, কদম আলী, সাবাস ভাই। মরদের মতো কাজ করছ।
আরো জোরে আওয়াজ তোল।

খোদ ইউনিয়নের সেক্রেটারী তার প্রসংসা করছে। আর চাই কি
—সে সমস্ত শক্তি দিয়ে শ্লোগান তুলল, কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর—
জনতার জবাব—বাংলাদেশকে মুক্ত কর।

তারপর কখন মিছিল এসে পৌঁছেছে রেসকোর্স ময়দানে বুঝতে
পারে নি কদম আলী। শুধু শোনা যাচ্ছে শ্লোগান। আর তখন
মিছিলের পর মিছিল আসছে। চারিদিকে শুধু মানুষের মাথা।
মিছিল মহাসমুদ্র। কদম আলী এত লোক কখনও দেখেনি।
শ্রমিক কৃষক মজুর মাঝি মধ্যবিত্ত কেরানি, ছাত্র-ছাত্রী। সামনে
বসে হাজার হাজার মেয়ে। সকলের হাতে উত্তোলিত লাঠি,
মুখে তীব্র তীক্ষ্ণ দীপ্ত আওয়াজ। কে যেন উড়িয়ে দিলে অসংখ্য
কপোত! আর উড়িয়ে দিলে স্বাধীন বাংলার বিশাল পতাকা।
একটি কপোত উড়তে উড়তে ফিরে এল আর বসল স্বাধীন বাংলার
পতাকার দণ্ডের ওপর। যেন অভিবাদন জানাতে এসেছিল বিপ্লবী
বাংলার পতাকাকে। জনতার লাখো কণ্ঠ জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল।
তারপর এলেন তিনি। জনতা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, জয়
বাংলা।

বাংলাদেশ কথা কর

তিনি বললেন, আঙ্গকের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। সমস্ত রেসকোর্স ময়দান হাততালি দিয়ে স্মরণ জানাল। কণ্ঠস্বরে কণ্ঠস্বরে বিদীর্ণ হ'ল মাচের বিপ্লবী বিকেল। তারপর সভা ভেঙেছে। মানুষ ঘরে ফিরেছে। কদম আলীও ঘরে ফিরল। রাত তখন দশটা।

কুলবাহু শুকনো মুখে সেই বিকেল থেকে বসে আছে। কদমকে দেখে ও কিছু বলল না। নীরবে হাত-পা ধোয়ার জন্য পানির বদনা এগিয়ে দিয়েছে। খড়মজোড়া এগিয়ে দিয়েছে। গামছা এনে দিয়েছে হাতে। কদম ওর মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে নি। বুঝেছিল ওর চোকে এতক্ষণে অশ্রু উদ্গত হয়ে উঠেছে। কদম আলী সমস্ত ঘটনাকে জড়িয়ে একটা অর্থ বের করবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু পারে নি। কিন্তু পরের দিন থেকে সবাই বলাবলি শুরু করল, আজকালের মধ্যেই কিছু একটা ঘটবে। পাড়ায় পাড়ায় প্রস্তুতি চলছে। হাতিয়ার নিয়ে সব তৈরী। চালকলে কাজ করত নেতায় পিসি। বাজখাই গলা। কথা বললে মাইকও হার মানত। পিসিকে ভয় করত না এমন ছেলেমেয়ে পাড়ায় ছিল না। সেই পিসি নেতাকে সঙ্গে করে এল ভোর ছটায়। বলল—হ্যাঁ রে কদম, বড় ভয় করছে। রায়ট হবে নাকি শুনছি। কি বলিস তুই?

রায়ট? অবাক হয়ে উত্তর দিল কদম। রায়ট কেন হবে পিসি? পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণকারীদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে। বলল বটে, কিন্তু লড়াইটা-যে কেমন করে হবে, তা সে নিজেও জানে না। বস্তিতে আবঙ্গালী শ্রমিকও ছিল অনেক। কেউ যায় আদমজীর জুট মিলে, আর কেউ কাজ করে ছোট ছোট কল-

কারখানায়। তাদেরও একজন এসেছিল কদমের কাছে। ওরই বন্ধু। বলেছিল—কদম ভাই, ব্যাপার-সাপার বুঝতে পারছ কিছু? কিছু একটা হতে যাচ্ছে ফয়েজ খাঁ, একটু বুঝতে পারছি। কিন্তু ...ফয়েজ খাঁ কদমকে হাতের ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। বলল—আমরা পুরানো বন্ধু। একটা কথা বলি। সাবধানে থেক। কেন, কেন? প্রায় অবাক হয়ে বলল কদম আলী।

কেন আবার—বুঝতে পারছ না, অবাঙালীদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে বাঙালীদেরকে খুন করবার জন্যে। প্রতিটি কারখানার মালিক অস্ত্র এনে লুকিয়ে রেখেছে।

শুনে একেবারে থ হয়ে গেল কদম আলী। ফয়েজ খাঁ আর কদম আলী একই শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। কতবার একসঙ্গে মিছিল করেছে। দু'জনেই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাঁদা আদায় করেছে, হরতাল সংগঠিত করেছে। অথচ আজ একে অণ্ডকে খুন করবে। ফয়েজ খাঁ যাবার সময় বলেছিল—যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।

ব্যাপারের গুরুত্ব কদম আলী আগে বোঝে নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে। ওর মনে পড়ল, যখনই মজতুররা বাঁচার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছে, তখনই বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা লাগিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। আদমজীনগরে এ ঘটনা আগেও ঘটেছে। সে নেতা আর পিসিকে ডেকে বলল—তোমাদের যা কিছু আছে, সে সব নিয়ে আমার বাসায় এসে থাক। কখন-যে কি হবে, বলবার উপায় নেই। কদম আলী দ্রুত ঘরে ঢুকে যাওয়াই শার্টটা পরতে পরতে ভাবছিল, যেমন—করেই হোক খবরটা ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে দিতে হবে। হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল ফুলবানু। বড় ভয় করছে গো, তুমি বাইরে যেয়ো না। এই দেখ, ডাকাও ফুলবানু হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল সেই জিনিস।

কদম আলী এই প্রথম অনুভব বসল—ফুলবানু আসন্ন প্রসবা। আজ, কাল, কিংবা পরশুর মধ্যেই একটি নবজাতক এসে যাবে তার

বাংলাদেশ কথা কয়

সংসারে। ফুলবানুর চিবুকে একটি আলতো চুমু রেখে ও বলল—
আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। আশরাফ ভাইয়ের কাছে
সব বলা দরবার।

একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে ও গল আশরাফের কাছে। কিন্তু
আশরাফ বাড়িতে নেই। রাস্তায় দোকানপাট বন্ধ। চারিদিকে
থমথমে নিস্তরুতা। বাড় আসবার পূর্বাভাস। কী-যে হবে, তার
একটা স্পষ্ট চেহারা বোঝবার উপায় নেই। দোকানে দোকানে
কালো পতাকা উড়ছে, তার পাশেই উড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীন বাংলার
পতাকা। ইউনিয়ন আগিসে গিয়ে সে দেখল, অফিস বন্ধ। শুনতে
পেল, আশরাফ গেছে আদমজীনগরে। ফিরতে গিয়ে দেখল
রাস্তায় পাকিস্তানী মিলিটারীর গাড়ি। কামান উত্তত রেখে টহল
দিচ্ছে। একটা দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে
লাগল। মিলিটারীর সামনে সে গেল না। কিন্তু পরক্ষণেই সে
শুনতে পেল রাইফেলের শব্দ। কামান আর গোলার হংকার।
তারপরে সে চোখের সামনেই দেখতে পেল আগুনের লেলিহান
শিখা। সব পুড়ে যাচ্ছে। আর্ত মাহুষের চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ
হচ্ছে, দলে দলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনতা যে-দিকে পারছে ছুটছে।
কদম আলি দূর থেকে দেখতে পেল, তার পাড়াটা পুড়ে যাচ্ছে।
ও শুধু একবার ফুলবানুকে ডাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে
তার স্বর বেরোল না। তারপর ভাবল নেত্যা ও তার পিসির
কথা। কিন্তু মাথার ভেতর কোন চিন্তা ঠাই পাচ্ছে না। সব
ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 'এ্যায় কদম আলী, কদম আলী
কোথায় যাচ্ছ পাগলের', মত চীৎকার করে কে যেন ডাকল তাকে।
পেছন ফিরে দেখে, আশরাফ ভাই। আশরাফ ওর হাত ধরে টেনে
নিয়ে চলল।

বলল, চল, পাড়ায় কোনো লোক নেই। সব পুড়ে গেছে। কে কোথায় গেছে কেউ জানে না। কত যে মরেছে, তার হিসেব কেউ জানে না।

কদম আলী বলল, কিন্তু ফুলবানু, নেতা আর পিসি।

আশরাফ বিষয় কণ্ঠে উত্তর দেয়—ও পাড়ায় যাবার উপায় নেই কদম। মিলিটারী বাড়িঘর পোড়াচ্ছে। অবাস্তালীরা লুট করছে।

কদম আলী বলে—তবু একবার যাব আমি। তুমি জান না,

ফুলবানুর পেটে-যে বাচ্চা আছে। আজ, কাল কিংবা পরশু.....

আশরাফ বলল—ও যদি বেঁচে থাকে, দেখা হবে। কিন্তু মৃত্যুর মুখে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।

আশরাফ চিরকালই একরোখা। কথার নড়চড় নেই।

পেছনে পড়ে রইল সবকিছু। ফুলবানু নেই। পিসি নেই। কতদিন থেকে ওরা হাঁটছে। পায়ে ফোঁস পড়ে গেছে। পেটে ক্ষুধা, শরীরে দারুণ ক্লান্তি। তবু একদিন ওরা এসে পৌঁছল মুক্ত অঞ্চলে—মুক্তিবাহিনীর শিবিরে। খেতে পেল, আশ্রয়ও পেল। সবচেয়ে বড় কথা সাহসও পেল। সব গেছে, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর ছজ'য় সেনারা আছে। আশরাফ ভাই মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাল। কিন্তু কদম আলীকে পাঠাল ফুলবানু, নেতা আর পিসির খোঁজে। যদি পাওয়া যায় কোন শিবিরে, কোন গেরস্থের বাড়িতে।

কত কথা মনে পড়ে কদম আলীর। পিসির কাছে কত বহুনি খেয়েছে। একদিন দেরী করে ফিরেছিল রাতে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু নেশা করেছিল। ফুলবানু তখন নতুন এসেছে। একা একা বাড়িতে। পিসি এসে বসে আছে। কদম এলে বকে দেবে। কদম ফিরে এল রাত বারোটায়। পিসি তখন রাগে ফুলছে।

চোখ হুঁটে জ্বলছে ভাঁটার মত। পিসিকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে কদম আলীর নেশা তখন ছুটে গেছে। পিসি দেখা মাত্র গর্জন করে উঠল, হারামজাদা লজ্জা করে না তোর কচি বৌটাকে একা কেলেকার ঘরে গিয়েছিলি তুনি। ও মা, তাতে আবার মদ গেল। হয়েছে। কি হবে কপালে গো। দাঁড়াও, কাল সকালেই আশরাফকে ডেকে আনব আমি। এর একটা বিহিত করে তবে ছাড়ব।

পড়ি মরি করে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল কদম আলী। কিন্তু তারপরেও পিসি ওকে আধঘণ্টা ধরে গাল দিয়েছে। মুখে যা এসেছে বলেছে। এবং পরের দিন সাত সকালে গিয়ে ডেকে এনেছে আশরাফকে। বিচারে শাস্তি হয়েছিল কদম আলীর। মাপ চেয়েছে পিসির কাছে—এমন কি ফুলবানুর কাছেও। পিসি একদিন গেরস্থ-ঘরের বৌ ছিল। স্বামী মারা যাবার পর আশ্রয় নিয়েছিল বড় ভাইয়ের কাছে। বড় ভাই-ভাইয়ের বৌও মারা গেল। সর্বনাশী মেঘনা একদিন সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বড় দাদার ছেলে নেতার হাত ধরে পিসি এসেছিল নারায়ণগঞ্জ। সেও আজ পনেরো বছরের পুরানো ঘটনা। পিসির তখনও যৌবন ছিল। কত লোভ এসেছে সামনে। কত মস্তপ মাতাল ঘুর ঘুর করেছে পেছনে। কিন্তু পিসির মুখখিস্তির সামনে দাঁড়াতে পারে নি কেউ। তার বাজখাঁই গলা পাড়ার এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত শোনা যেত। চালের কলে চাল ঝাড়ত আর ভাইপো নেতাকে পড়াত। বাপ-মা মরা ছেলেটাকে পিসি বুকের মধ্যে রেখে রেখে মানুষ করেছিল। নেতার বয়স এখন কুড়ি। পিসির চুল শাদা হয়ে গেছে কিন্তু গতরে তার কোথাও শক্তির অভাব হয় নি। পাড়ার মেয়েদের ছেলেপেলে হওয়ার সময় ডাক পড়ে পিসির। যাদের ছেলেমেয়ে হয় না, তাদের জন্তু ওষুধ দেয় পিসি। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী সবার বাড়িতে তার সমান যাতায়াত। পিসির নাম কেউ জানে না। কিন্তু পিসি বললে সবাই চেনে।

কুড়ি-একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল পিসি। তারপর শুরু হয়েছিল দুঃখের জীবন। কোনো দিন কারো বাড়িতে জলগ্রহণ করে নি, অথচ সবাই তাকে খাতির করে। আপদে-বিপদে পরামর্শ নেয়। কদম আলীকেই কি কম দেখাশুনা করেছে পিসি? অথচ আজ কোথায় গেল পিসি। কোথায় গেল নেত্য। আর কোথায় রইল ফুলবানু! আর ভাবতে পারে না কদম আলী।

ফুলবানুর কথা কত ভেবেছে কদম আলী। এতটুকু ফুলবানু এসেছিল ওর ঘরে একহাত ঘোমটা-টানা বৌ। বিয়ে দিয়েছিল পিসি। বলেছিল—হ্যাঁ রে কদম, সোনার পিত্তিমা তো এনে দিলাম। দেখাশুনা করবি তো ঠিকমতো?

কদম শুধু দেখাশোনাই করে নি, দিনে দিনে ও ভালবেসেছে ফুলবানুকে। আর ফুলবানু ফুলের মালার মত জড়িয়ে গেছে গলায়। শীতের দিনগুলোর কথা বড় মনে পড়ে। কদমের বুকে বুকটা উদোম করে কি রকম লেপটে জড়িয়ে শুয়ে থাকে ফুলবানু। কিছুতেই উঠতে দেয় না কদমকে। অথচ এখুনি কারখানার ভেঁা বাজবে। কদম শেষবারের মত সমগ্র শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফুলবানুকে। ওর বাহর খাঁচায় বন্দি নী ফুলবানু যেন আরো এতটুকু হয়ে যায়। কদম ওর লাল ঠোঁট ছটিকে প্রচণ্ড একটা চুমু খেয়ে বলে, হ্যাঁরে ফুল, তোর বুঝি সাধ মেটে না রে, না?

ফুলবানু কথা বলে না। কিন্তু ওর চোখে-মুখে সর্বদা ফুটে ওঠে গভীর পরিতৃপ্তি।

এমনি করে দেড়টা বছর কেটেছে ওর বিবাহিত জীবনের। তার পর ফুলবানুর পেটে এসেছে ওরই সন্তান। কিন্তু কি হ'ল শেষে? নিজেকেই প্রশ্ন করে কদম আলী। কেন এমন হ'ল? তারপর

বাংলাদেশ কথা কয়

গালাগাল দেয়, শালা খানের বাচ্চা হারামীর। তোরাও মরবি।
থাম্, মরবি। কুত্তার বাচ্চারা, তোদেরকে আমরা নিকেশ করব।
ওর চেখে-মুখে ঘৃণার আগুন ছলতে থাকে। সীমান্তের সমস্ত
শহরে ও ঘুরেছে। গেছে শিবিরে শিবিরে। কোথাও পাত্তা
মেলে নি নিত্যর, পিসির বা ফুলবানুর। ঘুরতে ঘুরতে আবার
ফিরে এসেছে আশরাফের সাথে। আশরাফ ওকে দেখেই
বলল, খুঁজে পাওনি তো? কিন্তু আমি পেয়েছি।

কদম আলী পায়ে পড়ল আশরাফের।

আমাকে নিয়ে চল আশরাফ ভাই, আমাকে নিয়ে চল।

সীমান্তে হাসপাতালের বেডে শুয়ে ফুলবানু। শিয়রে বসে পিসি।
ঘরে ঢুকেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কদম আলী জড়িয়ে ধরেছিল ফুল-
বানুকে। ভুলে গিয়েছিল সামনে আছে পিসি। পিসি গিয়ে
দাঁড়াল বাইরে। ফুলবানুই ওর সম্মুখ ফিরিয়ে আনল। বলল;
বাইরে যাও, পিসির সঙ্গে কথা বল।

কি কথা বলবে কদম আলী? শোক যদি স্তব্ধ হয়ে মূর্তিমতী হ'ত
—তাহলে তাকে তুলনা করা যেত পিসির সঙ্গে। পিসি ওকে
দেখেই একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই
বলল—নেতা নেই রে কদম। নেতাকে খুন করেছে খানের বাচ্চা
হারামজাদারা।

জীবনে পিসিকে এই প্রথম কাঁদতে দেখল কদম আলী। আর সে
কি কান্না! কদম আলী পিসিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। সাস্থনা
দেবার ভাষাও বলেছিল, পিসি গো, তুমি আমার মা। নেতা
নেই, আমি তো আছি। তুই আয় পিসি। তুই চল ফুলবানুর
কাছে। পিসি ফুলবানুর ছেলেকে কোলে নিয়ে বলে, কোথায়
গিয়েছিলি রে হারামজাদা তুই? ফুল তোকে মানা করেছিল না
যেতে? তবু তুই শুনলি না। বেটা ছেলেগুলো অমনি হয়। ফুলকে

পাঁচতে গি২য় আমার নেতাকে আমি হারালাম। নেতা একাই মরেছে। কিন্তু ফুল গেলে ছুটে। প্রাণ যেত।

তারপর আশরাফকে ডেকে বলে—নিয়ে যা কদমকে। মুক্তি-বাহিনীতে নাম লেখাতে নিয়ে যা। মাঝে মাঝে খোকাকে এসে দেখে যাবি। নেতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবি। যা হারামজাদা, যা। এ সেই পূর্বের পিসি। বাজুখাই গলা। মাইক হার মানে।

‘আর শুনে যা’, পিসি আবার ডাকে কদম আর আশরাফকে। ছেলে দেখেছিস্ তো, কেমন লাল টুকটুকে হয়েছে, দেখেছিস্ তো? কি নাম রেখেছি জানিস্? নাম রেখেছি লাল পণ্টন। ভাবিস্ নে, যা। গতর খাটিয়ে মানুষ করেছিলাম নেতাকে। ওকেও করব। কিন্তু বুঝলি, খানের বাচ্চা হারামীদেরকে নিকেশ করা চাই।

কদম আলীর ইচ্ছে হয়েছিল আর একবার ছেলেকে দেখে—ফুলবানুকে দেখে। কিন্তু পিসির ভয়ে রা করার সাহস পেল ন। শুধু মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করল।

লাল পণ্টন।

লাল পণ্টন।

লাল পণ্টন!

বুলি ভোম্মাকে লিখছি

সুভ্রত বড়ুয়া

আমি কখনো সমুদ্রে যাইনি। সমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গের বিপুল করতালির উপর ভাসতে ভাসতে কখনো সীমাহীন নীল দেখতে দেখতে নিজেকে বিস্মৃত হই নি। কখনো কখনো সাগরের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে ভালো লাগতো। হু-হু শব্দে ভেসে আসা বাতাসের বুকের গভীরে দাঁড়িয়ে এক-এক সময় বিহ্বল হতাম বটে কিন্তু সমুদ্রে নামতে আমার ভীষণ ভয়। আমি মাটির পৃথিবীর মানুষ—মাটির উপর যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ ভরসা থাকে। তুমি তো জানতে বুলি, আমি খুব বেশী কিছু চাই নি। চক মিলানো বাড়ি, চমৎকার গাড়ি—চকচকে মেয়েমানুষ—কোনো কিছুই ব্যাকুল হয়ে কামনা করি নি।

কিন্তু মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে কি কোনো নির্দয় সীমারেখা জোর করে টেনে দেওয়া চলে? না-কি অন্ধের নিভুল হিসেবে জীবনের ছক-কাটা ঘরে সবকিছু একাকার করতে পারা যায়? হয়ত যায়, হয়তো বা যায় না। সে আমি কোনদিন খুব বেশী করে ভেবে দেখি নি। কিংবা বলা যায়—ওই ভেবে দেখায় আমি কোনো ফল দেখতে পাই নি। অথবা দেখতে পেলেও কি।

আমি একজন সাধারণ মানুষ। অসাধারণ হবার চেষ্টা যে কখনো ছিল না—একথা ঠিক নির্দিষ্টায় বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছি না। প্রথম দিকে যখন ঠিক জীবনকে বুঝতে পারি নি, তখন আকাশকুসুম অনেক কিছুই তো ভেবেছি। ওই দেখ, কথাটা এমন ভাবে বলছি যেন জীবনকে আমি কত চিনে ফেলেছি! তুমি হলে বলতে—আহা! কত যেন ঝাকা! ঝাকা! ঝাকা কথাটা তুমি খুব ব্যবহার করতে। আর বলবার সময় বাচ্চা মেয়ের মতো মাথা হুলিয়ে এমন ভাবে তাকাতে—যেন—সাংঘাতিক একটা কিছু বুঝে ফেলেছ তুমি।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে তোমার মুখটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। কখনো নাক, কখনো চোখ, কখনো চিবুকের নিচে শাদা কণ্ঠ—কখনো বা এক টুকরো হাসি—অথচ সব মিলিয়ে পুরো তোমাকে একসাথে স্মরণ করতে পারছি না। এই মনে করতে না পারায় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—মুঠোর মধ্য থেকে বিন্দু বিন্দু জল চুইয়ে পড়ার কষ্ট।

আজ এ মুহূর্তে পেছনে ফেলে আসা পুরো জীবনটাকে আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়। কোন পরম পুরুষের কাছ থেকে জেনে নিতে ইচ্ছে করে জীবনে যা ঘটে তার সবই কি সত্যি! নাকি কোন স্বপ্নের মধ্যে আমরা জেগে ছিলাম, আবৃত কুয়াশার অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে জেনেছিলাম।

এখানে এই সাড়ে এগারোটার ছপুর ছুঁই ছুঁই রোদ্দুর এখন বাড়ির বাইরে এক চিলতে উঠানে গা বিছিয়ে তেজ নিচ্ছে। ঘরের ভেতর দোতলার একটা ঘরে আমি মেঝেয় শুয়ে লিখছি। কাকে? তোমাকে?

বুলি, আমার এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে তাহলে তুমি কি ভাববে জানি না। অথবা তুমি কিছু ভাবলে আমার কি! কারো ভাবনার মধ্যে অন্তর্গত হয়ে বেঁচে থাকায় কি সুখ। সুখ কি শুধু

বাংলাদেশ কথা কয়

বোধের মধ্যে, চৈতন্যের মধ্যে চোখ বুজে শুয়ে থাকা এঁাকুইরিয়ামের
সোনালি মাছ?

এখানে ছপূর গড়িয়ে যায়, বিকেল নামে তন্ময়। কাছের দাঁতায়
গাড়ির শব্দ। সিঁড়ির পাশের ঘরে থাকি বলেই সারাক্ষণ ওঠা
নামার উড়ন্ত শব্দ বুলতে থাকে মগজের মধ্যে। ঘর বলতে
বুঝি নিরাপদ আশ্রয়, নির্বিক্রম শান্তি।

তোমার ঠিক মনে আছে কিনা জানি নে—তুমি একদিন হাসতে
হাসতে (মজা করে?) ঘর বাঁধার কথা বলেছিলে।

ঘর! ছপূরে কলেজের ক্লাস পালিয়ে তোমার সেই বান্ধবীর বাসাঘ
এনে আমায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিলে—জামেন, আপনার জন্ত
ইংরেজির ক্লাস না করেই চলে এলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার ইংরেজির ক্লাস বিসর্জনের মতো চরম
আত্মত্যাগের জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার উচিত ছিল
কিংবা একটি ছরন্ত চুম্বন। অথচ আমি কি বোকা। বলেছিলাম
—‘না এলেই পারতে।’

ততক্ষণে আমার হাতে বেশ জোরে-সোরে একটা চিমটি কেটে
বলেছিলে—‘আহা।’

তোমার কথা বলার ঢং-টা আমার ভাল লাগে নি। নিজেকে
ভীষণ রকম ক্ষুদ্র আর অসহায় মনে হচ্ছিল। কেবলই জানতে
ইচ্ছে করছিল—কি এমন লাভ ওই লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা এবং
অর্থহীন শব্দ ছুঁড়ে।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলাম—‘আচ্ছা বুলি।
বলতে পার, এমনি ভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ!’

আমার কথা শুনে তুমি অবাক হবার ভাগ করেছিলে। তোমরা—
তুমি এবং তোমার মতো মেয়েরা, এত মধুর সব ভাগ করতে পার

যে, আমরা যেন ওই সব দেখে-শুনে নিয়মের ঘোড়ার মতো বর্তে যাই।

অতঃপর মূহ হেসে বলেছিলে—‘না মশাই, বর বাঁধার জন্তেই এতসব! আমরা ঘর বাঁধব, বাঁচব—তারপর একদিন মরে যাব। তখন থাকবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা।’

আমাদের ছেলে-মেয়েরা—একথা শুনতেই আমি চমকে তোমার দিকে চেয়েছিলাম। তুমি, চোখে চোখ পড়তেই, ঈষৎ হেসে মুখটা নিচু করেছিলে। আমি নিজের মনে হেসেছিলাম। কেন? ঠিক মনে করতে পারছি না। আচ্ছা—আমাদের ছেলে-মেয়েরা কথাটা বলে তুমি সেদিন কি বোঝাতে চেয়েছিলে? কিংবা আদৌ কিছু একটা কি বোঝাতে চেয়েছিলে তুমি?

আমি কী ভেবে হেসেছিলাম। এখন আর আমার কোন কিছুই মনে পড়ছে না। আদতে সে মুহূর্তে কিছু একটা কি ভেবেছিলাম? নিজের ভাবনাগুলোকে যদি সেলুলয়েডের ফিতের মতো কিছু একটাতে বেঁধে রাখতে পারতাম! তাহলে হয়তো একদিন ফের দেখতে গিয়ে অবাক হতাম। কত অসম্ভব অবাস্তব সব ভাবনা! মনের মধ্যে নিজের একটি ভুবন তৈরী করেছিলাম—সে আমার একান্ত নিজস্ব। দোতলার ঘরে হাওয়া দিচ্ছে। কোন্ দিকের হাওয়া—বুঝতে পারছি না। এখানে দিক নেই—আমি চিনি না। রাস্তায় নেমে মানুষ দেখলে ভয় পাই, গাড়ি দেখলে চমকে উঠি। ভয় আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রবারের পুতুল। চলতে ফিরতে শব্দ করে—হাওয়ায় মন রাখলে যেন কান্নার শব্দ শুনি।

জীবনটা সত্যিই আশ্চর্য! বুলি, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কি আমি ভাবছি! কি ভাবছি সেটা কি নিজের কাছেও খুব বেশী স্পষ্ট? সাত সমুদ্রের তেরো নদীর পারে জনাকীর্ণ লগুন শহরে বসে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

বাংলাদেশ কথা কয়

কি ভীষণ ভয়ংকর সময়ের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। সবকিছু কেমন যেন উল্টে গিয়ে চেনা-ভুবনের সাজানো ছবিটা হারিয়ে গেল কোথায়! কোথায়?

সাজানো বাগান হয়ে গেল এলোমেলো!

এলোমেলো! কত লক্ষ লোকের জীবন হারিয়ে গেল!

বুলি, তোমার ওই সাজানো ঘরে বসে এখন তুমি কি ভাবছ জানি না। তোমার ভাবনায় অবশ্য আমাদের কিছুই এসে যায় না। অথচ তবু ঠিক লিখতে বসে তোমার কথাই মনে পড়ল। কেন? নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করছি। কিন্তু জবাব দেবে কে!

আমাদের সেই স্বপ্নের শহরটার কথা তোমার এখনো মনে আছে কিনা জানি না। আশৈশব সেই স্মৃতির শহরকে আমি কখনো ভুলতে পারি না।

আমি তো ভুলতেও চাই না!

পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় নিজেকে ভীষণ একা লাগছিল। সারা ছপ্পুর ঘুমোবার নাম করে বিছানায় শুয়ে বই নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছি। Franz Kafka-র Diary। ঠিক ডায়েরী বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়। দিন-লিপির নির্ভেজাল সংবাদ পরিবেশন নয়। তার চেয়েও বেশী। একজন অস্বিষ্ট স্রষ্টার আন্তরিক প্রতিবেদন।

পড়তে পড়তে নিজের দিকে বার বার ফিরে চাইতে ইচ্ছে করে। রেডিওটা খারাপ হয়ে ছিল। টিউনিং-এর কাঁটা কেবল এক জায়গায় অনড় অচল। চালিয়ে দিলে ঢাকা-বেতারের অসহ কমান্ডিয়াল সার্ভিস।

[এই মুহূর্তে আমার পাশে বন্ধুরা আড্ডা মারছে। সারাদিনের কাজের ফাঁকে সামান্য অবসর। বিবিধ ভারতীয় অনুষ্ঠানে মহম্মদ রফি গাইছেন—মুঝে তুম ইয়াদ আইয়ে।]

ভালো কথা! ইয়াদ আইয়ে। ইয়াদমানে স্মরণ। স্মরণে কতজনকেই

বুলি তোমাকে লিখছি

তো মনে পড়ে। কিন্তু একজনের কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে।
কে সে ?

সেদিন দুপুরে কার কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়েছিল - আজ আর
তা মনে নেই। মনে নেই! মাঝে মাঝে ক্যাপস্টানের প্যাকেট
থেকে একটা করে সিগারেট তুলে নিয়ে দেশলাইয়ের গায়ে কাঠি
ঘষি। সিগারেটের ধূসর ধোঁয়া কেমন স্বপ্নের মতো শূন্যে মিলিয়ে
যায়। শূন্যে মিলিয়ে যায় আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।
আমাদের সাধের স্বপ্নের। এমনি করে শূন্যে শেষ হয়ে যায়।

বুলি, না আমি অনুশোচনা করছি না। যা পাবার কথা ছিল তা
পাই নি বলে কপালে করাঘাত করে, দুঃখ করে লাভ কি!
সারা দুপুর এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিয়ে বিকেলে উৎকর্ষ
হয়েছিলাম আইনুলের টেলিফোনের জন্তে। প্রতিদিন বিকেলে
আইনুল আসত। আমার আগে টেলিফোন। আমি কাপড় পরে
তৈরী থাকতাম। দরজার পর বন্ধ গেটের বাইরে গাড়ির হন
শুনলেই বুঝতাম আইনুল এসে গেছে। তারপর সেই চেনা গাড়ি,
চেনা রাস্তা, চেনা দোকান এবং চেনা জায়গায় বসে চা খাওয়া।
চা খেতে খেতে গল্প। অথবা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

বুলি, তোমার মনে পড়ে কিনা জানি না। মাঝে মাঝে দুপুরে
একটা চীনা হোটেলে গিয়ে বসতাম আমরা। ছোট হোটেল।
খাবারের অর্ডার দিয়ে ঘণ্টা খানেক গল্প করা চলত। কাউন্টারে
বসত যে ছেলেটা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসত। কেন ? ও কি
বুঝতে পেরেছিল আমরা খেতে নয় বরং গল্প করতেই আসি !
বসে বসে কথা বলতাম। কি কথা ? হাজার রকমের কথা। আজ
এই মুহূর্তে সে-সব কথার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই না।

বাংলাদেশ কথা কর

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। আমি কিন্তু তোমার যাবার পর কখনো কোন দিন আর ওই হোটেলে খেতে যাই নি। কখনো পাশ দিয়ে যেতে হলে ভীষণ ভয় পেতাম। নিজের সব কিছু হারিয়ে যাবার ভয়।

পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় আইনুল আসে নি। টেলিফোনও করে নি। সন্ধ্যায় হতেই আমি একা বেরিয়েছিলাম। সারা শহর কেমন এক চাপা উদ্বেজনায় থমথম করছে। লোকগুলোর চোখে মুখে তীব্র আশঙ্কার ছাপ। রাস্তায় নামতেই খোলা বাতাস গায়ে হাওয়া লাগিয়ে গেল।

মোড়ের দোকানটা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে দাঁড়ালাম দোকানী সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে খুচরো পয়সা গুন্টে গুন্টে বলল—‘শেখ সাহেবের সাথে মিটমাট হবে নাকি, সাব?’ দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকতে গিয়ে আমি থমকে পড়েছিলাম। কি উত্তর দেব আমি! আমার নিজের তো কিছুই জানা নেই।

বললাম—দেখা যাক কি হয়।

কথাটা যেন নিজেকেই বলেছিলাম। দেখা যাক কি হয়। নেহাৎ ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনে। ভাবছিলাম কোথায় যাব।

আমার আজন্ম স্মৃতির শহরটাকে ঠিক যেন চিনতে পারছিলাম না। রাস্তা ফাঁকা। কমিশনারস্ হিলটাকে বাঁয়ে রেখে ফুটপাথ দিয়ে এগোছিলাম। ডাস্টবিনের ময়লা উপচে পড়ছে একপাশে। পেছাবের গন্ধ। এক জায়গায় পানি জমে আছে। সাবধানে হাটছি। ডান হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ছে। রাস্তার অপর পাশ দিয়ে একদল মেয়ে কথা বলতে বলতে আমাকে পেছনে রেখে

বুলি তোমাকে লিখছি

বিপরীতে চলতে গেল। এদের মত অনেকেই প্রতিদিন বিকেলে হাঁটতে দেখি। জামাতখানা থেকে বেরিয়ে ওরা চলে যায়। আবার প্রতিদিন বিকেলে আসে। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে, ওই উচু দেয়ালটার অন্তর্গত কি এমন আছে—যেখানে ওরা প্রতিদিন আসে।

বুলি, আমার বন্ধুরা বলে—ছুঁড়িগুলো দেখতে খাসা মাইরি! ওই দেখ কথাটা এমনভাবে বললাম যেন এতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ-অনাগ্রহ নেই। না, তোমার কাছে সাধু সাজবার এতটুকু সদিচ্ছ। আমার থাকার কথা নয়। আমি শুধু একটি কথাই বলতে পারি—আমিও তো একজন মানুষ।

রাস্তাটার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। এখানটায় মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারি। আর কাউকে পটাতে পারলেই সামনের ঘিঞ্জি নোংরা ছোট রেস্টোরাঁটায় বসে চা খাই।

আজ কেউ নেই। ফাঁকা জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে।

ঠিক এখানটায় এসে আর একজনের কথা মনে পড়ছে। ওকে তুমি চেন বুলি। ভীষণভাবে চেন। নাম শুনলে হয়তো চমকে উঠবে। চমকে উঠে স্থির নিষ্কম্প দৃষ্টিতে বলবে—এ আমি জানতাম। কিন্তু আমি জানতাম না। অথচ ঠিক আমিই শেষপর্যন্ত জড়িয়ে গেলাম ওর সাথে।

যুঁই সবই জানত। সব জেনেও সামনে বসে নিচের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—‘আমার যে আর অন্য কোন উপায় নেই। আমি চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারি নি। নিজেকে ফাঁকি দেবার সাধ্য আমার নেই।’

বুলি, আমি ওকে ফেরাতে পারি নি।

মোড়ের খালি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করলাম। বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। ভাবছিলাম যুঁইদের বাসায়

বাংলাদেশ কথা কয়

যাব কিনা! তোমার বান্ধবী যুঁই। যুঁই আমাদের সবকিছুই জানে বুলি, সবকিছুই জানত। আর কখনও তোমাকে নিয়ে কথা উঠলে হঠাৎ করে কেঁদে ফেলত।

সেদিন যুঁইদের বাসায় যাই নি। বাঁদিকের পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে। রেস্টোরাঁটায় ঢুকতেই দেখা পেলাম সবার। সব মক্কেলই আছে তুমুল কথা চলছে। একদিকে বসে পড়লাম। মনে পড়ল—আমার এককাপ চা খাওয়া দরকার। বিকেলে চা না খেলে এমন মাথা ধরে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে কথার মধ্যে ডুবে গেলাম। সবাই কেমন উত্তেজিত। কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু কি। এমন কেউ কি নেই যে বলে দিতে পারে কি এমন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন এগিয়ে আসছে নির্ধারিত ট্রেনের মতো, অজগরের মতো।

নিরঞ্জন পান চিবোচ্ছিল আর কেবলই বাইরে গিয়ে কি যেন দেখছিল। সামনে ওয়াসার কাজ হবে বলে রাস্তাটা খোঁড়া। জলের পাইপ লাইন বসাবার জন্যে বিরাট সব লম্বা গর্ত। অসাবধানে পেরোতে গেলেই গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে।

কোণার দিকে এক টেবিলে বসে শাহেদ, লতিফ আর হাবিব কি যেন বলছে। কি!

আগের দিন বিকেল থেকেই সারা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। রোববার সকালে গিয়ে আমি জাহাজটা দেখেছিলাম। আইনুল সকালে এসে বলেছিল—‘চল, পোর্টে যাবি।’

আমি ওর সাথে বেরিয়েছিলাম। তারপর সেই জাহাজটা কি যেন নাম সোয়াত না কি দেখেছিলাম। পঁচিশ গজ দূর থেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার সময় আইনুল বলেছিল—এ যে দাঁড়িয়ে, ওটাই অল্পবাহী জাহাজ।

আমি ভয় পেয়েছিলাম ওর কথায়! জনা আষ্টেক সৈন্ত রাইফেল

বুলি তোমাকে লিখছি

হাতে দাঁড়িয়ে সামনে। ওরা আমাদের দেখছিল। চোখের দৃষ্টিটা যেন রক্তখেকো বাঘের মতো।

গিয়ারটা বদলাতে বদলাতে আইনুল বলেছিল, 'লেবাররা সাফ জবাব দিয়েছে—কেউ মাল নামাবে না, নামাতেও দেবে না।'

কি যেন একটা ভাবছিলাম আমি আইনুলের কথার উত্তরে, শুধু বলেছিলাম—'ও'।

আইনুল আর কথা বলে নি। স্ট্রিয়ারিং হুইলে হাত রেখে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছিল। পোর্টে আইনুলের কাজ শেষ। এবার কোথাও গিয়ে বসব আমরা অথবা কোনো স্পেশাল শো'র টিকিট।

২৪-এ মার্চ বিকেল তিনটে থেকেই শুরু হ'ল গণ্ডগোল। সৈন্সরা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে গিয়েছিল। শ্রমিক-জনতা বাধা দিল। না—অস্ত্র নামানো চলবে না। শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র আমরা নামাতে দেব না।

তারপর। তারপর শুরু হ'ল গুলী। অনেক লোক মরল। ততক্ষণে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড, গাড়ি চলাচল বন্ধ। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল একটা তীব্র বিক্ষোভ।

তারপর কেমন করে যেন মিটমাট হ'ল। কিন্তু ব্যারিকেড সরল না। সারারাত অতস্ত্র প্রহরীর মতো জেগে রইল মানুষ। জেগে রইল গুল্লরগ, শব্দ, সন্দেহ, উদ্বেজনা আর চাপা বিক্ষোভ।

এই একদিনে সব কিছু কেমন যেন বদলে গেছে। আমি চা শেষ করলাম, সিগারেট ধরলাম। সব কিছু কেমন যেন বিশ্বাস লাগছিল। থমথমে পরিবেশ। বন্ধুরা সবাই যেন ভয়ংকর একটা কিছু আশা করছে।—ভীষণ ভয়ংকর তীব্র অচিন্তনীয়।

বাংলাদেশ কথা কর

হঠাৎ মনে পড়েছিল যুঁইদের বাসায় গিয়ে একবার ঘুরে আসলে ভাল হ'ত। ওরা নিশ্চয়ই এই নিয়ে ভাবছে।

কয়েকদিন আগে যুঁইকে যখন বলেছিলাম—‘তু-এক দিনের মধ্যেই ঢাকায় ফিরছি’—ও প্রায় আঁতকে উঠেছিল।

ভীষণ কাছে এসে বলেছিল—‘না লক্ষ্মীটি, না। পঁচিশ তারিখের আগে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।’

যুঁই। বুলি, যুঁই-এর নাম করলেই তুমি রেগে যেতে। তুমি ওকে একেবারে সহ্য করতে পারতে না। কেন? হয়তো তোমার ওই রাগের পেছনে একটা যুক্তি ছিল। তুমি কি ভেবেছিলে—আমি তোমাকে নিয়ে খেলছিলাম?

এই মুহূর্তে এর বিপরীত কথাটাই আমি ভাবতে পারি। আমার জায়গায় তুমি আর তোমার জায়গায় আমি। মানুষ কী ভীষণভাবে বদলে যায়!

বুলি, তোমার বিয়ের দিন সানাই বেজেছিল কিনা জানি না। সানাই শুনলে আমার কান্না আসে। মনে হয়, আমি যেন ডুবে যাচ্ছি। আমার চারিদিকের মানুষ, উজ্জল আলো, শব্দ-ছন্দ-গান সবকিছু পেরিয়ে আমি যেন বিশ হাজার লগী অতলে তলিয়ে যাচ্ছি! সেই সন্ধ্যায় যুঁইদের বাসায় আর যাওয়া হয় নি। কখন আটটা বেজে গেল। পোকার মতো মানুষেরা রেডিও ঘিরে খবর শুনছে।

খবর। শব্দ! শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে একটা কিছু দাঁড় করানো চলে। আমার পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খবর শুনছিলাম। ইয়াহিয়ার নাম বলতেই কে একজন ভিড়ের মধ্যে চীংকার করে বলল—গুয়ারের বাচ্চা।

তুমিও নিশ্চয়ই এতদিনে অনেক খবর শুনছে। সংবাদপত্রে বোম্ব

বুলি তোমাকে লিখছি

টাইপে বাংলাদেশের খবর অনেকবার নিশ্চয়ই ছাপা হয়েছে। এই চার মাসে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে এইসব দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে তোমার অজানা আর কিছুই নেই। তবু আর একবার বলি—আশি লক্ষ লোক দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদদের হাতে মরেছে দশ লক্ষ—হাজার হাজার মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে—শিকার হয়েছে নরপশুদের কামোন্মাদসের।

জানি, এসব তোমারও জানা। তোমার লগুনের ঘরে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে তুমিও নিশ্চয়ই আতঙ্কে ভয়ে শিউরে উঠেছ। ভেবেছ—এও কি সম্ভব!

হ্যাঁ—সম্ভব।

আমি এখন সংবাদ পরিক্রমায় আবার নতুন করে তাই সব শুনলাম। শুনতে শুনতে আজকাল আর ভয় পাই না। তেমন কোন চিন্তাও আসে না। শুধু জানি—আমরা এখন লড়ছি। তুমি রেগে যেও না বুলি। আর একবার যুঁই এর কথা বলছি। সে দিন সন্ধ্যাও ওদের বাসায় আমি যাই নি। যেতে পারি নি। না, তার পরদিনও না। তারপর আর কখনো যাই নি। যাবার দরকার হয় নি।

শুধু খবর পেয়েছি—ওর সেই ছদ্দান্ত ছোট ভাইটি নরপশুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছে। আমি ওর কোনো খবর জানি না। জানি না বেঁচে আছে কিনা! কিম্বা বেঁচে থাকলেও এই মুহূর্তে আমি কিছুই করতে পারি না।

বুলি, এসব জেনে তোমার আনন্দ হবে এমন আশা আমি করি না। কিংবা না জানলেও কি এমন ক্ষতি তোমার!

আমি নিয়তির সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে গ্রহণ করেছি। আমরা সবাই জীবনের কাছে শপথ নিয়েছি—আমাদের ছেলে-মেয়েরা বেঁচে থাকবে। না, তোমার আমার ছেলে-মেয়েরা নয়। সে

বাংলাদেশ কথা কয়

কথার কোন প্রশ্নই আজ আর ওঠে না। তা ছাড়া—এতদিন পর
কথাটা তোমার মনে না থাকারই কথা।

আমি বলছি—আমাদের ছেলে-মেয়েরা। স্বাধীন বাংলাদেশের
আগামী দিনের মানুষেরা। ওরা সুন্দরভাবে বাঁচবে বলেই
আমরা মরছি !!

স্বপ্ন

ফজলুল হক

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনলাম—আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা আর্ত চীৎকারের শব্দ বানে এল। চোখে দেখলাম এক বলক রক্ত—যা আমার জানালার পর্দাকে রঙিন করে তুলল! চোখ মুদে বুঝলাম, জানালার কাছে দাঁড়ানো রাস্তার পাগলটাকে ওরা গুলি করেছে। এখন বুঝি পাগল মারা শুরু হ'ল!

মনে হ'ল জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি। এই বীভৎস স্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম আসে কই? পাড়ার কোণের বাড়ি থেকে ওরা সন্ধ্যা রাতে ছ'টি মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। একটু আগে শুনেছি। ভেবেছি ওদের হত্যা করল না কেন? হত্যা করলে তো ওদের পরিবারে আর এই অশান্তির ঘূর্ণিঝড় বইত না! কারণ পরশু রাতে একটি মেয়ে... যে-মেয়েটি এই পাড়ারই কুখ্যাত ইসমাইলের পরিচিতা বলে আশ্রয় পেয়েছে ঐ বাড়িতে...যে-মেয়েটির চরিত্র-সম্পর্কে সব ই সন্দিহান... শুনলাম তাকে নিয়ে যাওয়ায় কেউ কিছু মনে করে নি...শুধু ঐ বাড়ির রাজিয়াকে নিয়ে যাওয়াতেই যত অশান্তি!

আমার পাড়ায় আর মেয়ে নেই। ওরা কাল চলে যাবে, সব ঠিক। কারণ ওরা কোথায় যাবে এটা ঠিক করা সম্ভব হয় নি এর আগে।

বাংলাদেশ কথা কয়

পাড়ার সবাই জানে রাজিয়া এই পাড়ার মাহবুবকে ভালবাসে।
অথচ মাহবুবের খুব বেশী পছন্দ নয় রাজিয়াকে! ওরা গরীব।
তবে শেষপর্যন্ত মাহবুবই তাদের গ্রামের বাড়িতে জায়গা দেবে
বলে সব ঠিক করে দিয়েছে!

ওরা ফিরে আসে নি। শোনা গেছে, মেয়েদের নিয়ে গিয়ে আবার
ফিরিয়ে দিয়ে যায়—ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়...বাড়িঘর ছেড়ে
যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু ওরা এখনও ফিরে আসে নি।
কাল সকাল পর্যন্ত সময় পেলে হয়তো এ পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটত
না। কিন্তু নিয়তির পরিহাস! সবাই দোষ দিচ্ছে, ঐ ইসমাইলের
ওই মেয়েটা—শাহীন সুলতানার জুই নাকি মিলিটারিরা ঐ
বাড়িতে হানা দিয়েছিল। কারণ শাহীন সুলতানা নাকি
চরিত্রহীন। কোন এক অফিসের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কল-
গ্রহণকারিণী হ'লেও নাকি আসলে সে একজন কলগাল' মাত্র!
ইসমাইলের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক নাও থাকতে পারে; কারণ
বহু মেয়েই নাকি বিভিন্ন কারণে তার কাছ থেকে প্রয়োজনমত
সাহায্য পায়। ইসমাইল পাড়ার সদাঁর নয়, কিন্তু তাকে ছাড়া এ
পাড়ার কোন বিচার আজ পর্যন্ত হতে দেখি নি।

হঠাৎ ইসমাইল এসে আমার ঘরে ঢুকল। বিছানা ছেড়ে উঠলাম
না। শুধু তার দিকে চোখ খুলে তাকালাম।

“পাগলাচাচারে হেরা মাইরা চইলা গেছে। লাশটা উঠাইতে
নিষেধ কইরা গেছে। কিন্তু আমি কি করুম মাস্টার সাব?
জবাবে আমি কি বলতে পারি?”

“আমার যা করণের আমি করতামি। মুসলমান হইয়া মুসলমানের
লাশ রাইতে শিয়াল-কুত্তারে খাইবার দিবার পারমু না। এতে
যদি হেরা আমারেও গুলী কইরা মারে—মারুক। আমার কাম
আমি কইরা ফালামু।”

জানি, স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই সে ঐ লাশ সন্নিবেশ কবর দেবার ব্যবস্থা করেই আমার কাছে এসেছে।

ফিরে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল; কি যেন বলতে চাইল। এবার আমিই জিজ্ঞেস করলাম, “ইস্‌মাইল, রাজিয়াদের খবর কিছু পেলে?” বলবে কি বলবে না একটা ভাব দেখিয়ে ইস্‌মাইল বলল, “হেই খবর আনতেই তো আমাদের দেরি হইল। বুজছেন মাস্টার সাব, এই পাড়ায় এই দুইওটা কাম আমার গরহাজিরিতে হইয়া গেল। আমি থাকলে...হয় জান দিতাম নয় একটারেও হাইবার দিতাম না। তবে একটা কথা কই মাস্টার সাব। একেবারে সাজা কথা। রাজিয়ার লগে শাহীনের লইয়া গেছে শুইনা অবধি খুশি হইছি।”

আমার এবার চমকানোর পালা। খুশি হয়েছে ইস্‌মাইল। বিছানায় উঠে বসলাম। কিছু বলার আগেই ও বলতে শুরু করে—

“মাইনষে কয়, শাহীন খারাপ মাইয়া, কিন্তুক আমি ওরে পরীক্ষা কইরা দেখছি, ওর মত সাজা মাইয়া নাই। হে ঐ পাঞ্জাবীগোর অফিসের অমন টেকার চাকরিও ছাইড়া দিছে। যেটারে একবার ঠিক বইল। মনে করব হেই রাস্তা থাইক্যা ওরে হটাইবার পারে এমন মানুষ হনিয়াতে নাই। তবে বুজলেন না, একটু খোলাখুলি চলাফেরা করনে ওর একটু বদনাম আছে। হের পুরানা পন্টনের বাড়িতে হামলা কইরাও মিলিটারিরা অর লাগুড় পায় নাই। হে পলাইয়া সিধা আমার এই বাড়িতে! তারপরই তো আমি অরে রাজিয়াগো বাড়িতে আইনা দিলাম। আপনি তো জানেন, আমার বাড়িতে কোন মেয়া মানুষ নাই...পাড়ার সব মেয়া মানুষ দেশ-গ্রামের বাড়িতে। তবে একটা কথা কই...এবারও শাহীন ঠিক পলাইবার পারত কিন্তু রাজিয়া পারব না বইলাই হে পলায় নাই!” আমি আরো অধিক হই ইস্‌মাইলের কথায়।

“বুজলেন না তো? শোনেন, দেইখা লইএন, শাহীন ঠিক সময় মত রাজিয়ারে বাঁচাইয়া দিব।”

কথা শেষ করে আমার কাছে কোন কথা শোনার জন্ত আর সে অপেক্ষা করল না! দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, তার বলা শেষ। আর বোমা মারলেও একটি কথা তার মুখ থেকে বের করা যাবে না।

হঠাৎ দরজার ওপর দেখলাম মাহবুব দাঁড়িয়ে।

“মাষ্টার সাহেব, ঘুমাতে পারছি না।”

চুপ করে থাক। ছাড়া আর উপায় কি? বড়লোকের আত্মরে ছেলে।

“বিরক্ত করছি না তো?”

এবার কথা বলতেই হয়। “না, না, বসো।”

“না, বসবো না, মাষ্টার সাহেব। আপনি রাজিয়াদের খবর শুনেছেন?” মাথা নাড়লাম।

“আমার সব ভাবনা-চিন্তার সমাধান করে ফেলেছি। যে-দেশে রাজিয়ার মত মেয়েকে ওরা ধরে নিয়ে যেতে পারে—সে দেশে বেঁচে থেকে আর লাভ নেই মাষ্টার সাহেব।”

শক্তি হয়ে প্রশ্ন করি, “আত্মহত্যা করবে নাকি?”

“না, আত্মহত্যা করব না। এর প্রতিশোধ নিতে চাই। আমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এই এক কাপড়ে। কারণ আববা, আন্না জানতে পারলে যেতে দেবেন না!” প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়েই আবার সে বলতে থাকে, “মাষ্টার সাহেব, আমি মুক্তিফৌজে যোগ দিতে যাচ্ছি। এর আগে কোনদিন কোন কাজে মন স্থির করার প্রয়োজন মনে করি নি—যা ইচ্ছে তাই করেছি। এবার সত্যিই মন স্থির করে ফেলেছি। রাজিয়াকে আমি হয়তো কোনদিনই বিয়ে করতাম না, কিন্তু ও যদি ধর্ষিতা হয়েও বেঁচে থাকে তবে বলবেন; ওকে ছাড়া আমি কাউকেই বিয়ে করব না।”

ঝড় উঠিয়ে দিয়ে যেন ও চলে গেল।

দু'টি চরিত্র ছই রকম, কিন্তু আজ ছ'জনেই যেন এক!

ইস্মাইল আর মাহবুবকে কোনদিন কোন মিছিলে দেখি নি, কিন্তু আজ আমার মনে হ'ল, এরা মিছিলেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মনে পড়ল আরেক দিনের কথা।

পঁচিশে মার্চের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের রাত্রিতে এদের একবার দেখেছিলাম। গভীর আঁগ্রহে শঙ্কাকুল কণ্ঠে এরা ছ'জনেই এসে জিজ্ঞেস করেছিল, “মাষ্টার সাহেব, শেখ সাহেব বেঁচে আছেন তো?” সেদিন জবাব দিতে পারি নি, কারণ, আমার মনেও ঐ একই জিজ্ঞাসা ছিল।

আজ মাহবুব মুক্তিফৌজে যোগ দিতে যাচ্ছে, কারণ তার পরিচিত। আজ প্রিয়ার আসন দখল করেছে দখলকারীর হাতে পড়ে। ইস্মাইলের কূটবুদ্ধি প্রথর হয়েছে তার পাড়ায় হামলা হওয়ায়। তার ইজ্জৎ গেছে, কারণ পাড়ার মেয়ের ইজ্জৎ রাখার যোগ্যতা তার নেই বলে মনে করছে। তা'হলে ইস্মাইলের কিসের বড়াই! ঘুমের সাথে মিতালি কখন হ'ল জানি না, কিন্তু দরজার ওপর ধাক্কার আওয়াজে জেগে গেলাম।

“মাষ্টার সাব!” হালকা আওয়াজ। ধীরে ধীরে বুঝলাম, এ গলা ইস্মাইলের!

দরজা খুলে দিতেই ইস্মাইল ঢুকে বলতে শুরু করল।

‘রাজিয়াগোরে দেশে পাঠাইয়া দিয়া আইলাম! রাইতে রাইতেই শহরের বাইরে চইলা যাইব খেতের মধ্য দিয়া।’

আমি প্রশ্ন করি, “রাজিয়া!”

“হ। রাইত ছইটার সময় হে আইয়া পড়ছে। কইছিলাম না, শাহীন একটা ব্যবস্থা করবই! ওর ইজ্জৎ বাঁচাইয়া দিছে। কিন্তুক....” বুঝতে পারলাম ওর গলা ধরে গেছে!

বাংলাদেশ কথা কয়

“কিন্তু মাষ্টার সাব, শাহীনটা বুঝি বাঁচতে পারবে না। রাজিয়া নিজের চোখে ডাখছে, শাহীন ঐ মেজরটারে গুলী করেছে! মদের ঝোঁকে যখন মেজর প্রায় বেসামাল তখন শাহীন বুঝি একটু একটু কইরা খেলাইতে খেলাইতে ইশারায় রাজিয়ায় কইছে পলাইতে, আর নিজে চালাইছে গুলী... কইছিলাম না, হে মাইয়া সব পারে।”

কিন্তু আমি কি বলতে পারি!

“আমি যাই। আজই রাজিয়াগো খালি বাড়িতে থাকুম।”

প্রশ্ন করবার আগেই ইস্মাইল আবার বলতে শুরু করে—

“বুজলেন না? যদি শাহীন পলাইবার পারে তবে ঠিক এই বাড়িতেই আইব। আর যদি গুলগোলে পইড়া মইরা যায় তবে ঐ মেজরের মরণের প্রতিশোধ নিতে তার সান্দ্রোপান্দ্রোরা এই বাড়িতে নিশ্চয়ই হানা দিব। আমি তাই ঐ বাড়িতেই থাকুম। তবে মাষ্টার সাব, দোয়া করবেন, এবার ঘ্যান চালসটা মিস্ না করি! একেবারে ষোল আনা তৈয়ার।”

ইস্মাইল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এবার আমার চিন্তাধারার মোড়টা ঘুরে গেল!

করতাম সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টারী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল ছেড়েছি; কিন্তু আমি কি কাজ করেছি?

উঠে বসলাম। ঘড়িতে দেখলাম রাত তিনটে।

ছোট ব্যাগটায় কাপড় ভরলাম।

আমি কি আর কিছুই করতে পারব না? সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নেওয়া আছে আমাদের প্রত্যেক শিক্ষকের। তবে আর ভয় কি! আমিও মাহবুবের পথই অনুসরণ করতে পারি তো?

রাস্তা কি এখন নিরাপদ?

দূর আবার প্রশ্ন? নিজের মনকে বোঝাই।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হ'লে ঐ গলি দিয়ে একবার রাজিয়াদের বাড়িতে যাই।

কিন্তু গলি শেষ হবার আগেই বুঝলাম, রাজিয়াদের বাড়ি ঘেরাও করেছে মিলিটারিরা।

চীৎকার শোনা গেল, “কোন হায় অন্তরমে, বাহার আও।” কোন জবাব নেই।

আবার শুনলাম ঐ চীৎকার।

হঠাৎ শুনলাম “ফায়ার” - ট্যা ট্যা ট্যা করে কয়েক রাউণ্ড মেশিনগানের গুলী চলল। একটা আর্ত চীৎকার শুনলাম। বুঝলাম, রাজিয়াদের ছাগলটাকে ওরা মেরেছে। এক মিনিট ছ'মিনিট পাঁচ মিনিট, সব চুপ! হঠাৎ রাইফেলের আওয়াজ শুনলাম। গুডুম! আবার গুডুম! আর্ত চীৎকারও ছ'টা শুনলাম! এইবার আবার চীৎকার করে আদেশ দেওয়া হ'ল, “ফায়ার”—ট্যা ট্যা করে চলতে লাগল মেশিনগান। কিন্তু তার মধ্যেও আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম রাইফেলের আওয়াজ!

বেশ কয়েকবার।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল আশপাশ। পরমুহূর্তে দেখলাম আগুনের লেলিহান শিখা। রাজিয়াদের বাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আগুন আর আগুন! ভেতর থেকে রাইফেলের গুলী চলছিল।

আগুনের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম মিলিটারিরা লাশ ওঠাচ্ছে একটা, দুটো, পাঁচটা। তাদেরই কাপড় পরা। অর্থাৎ ভেতর থেকে গুলী করে এদের মারা হয়েছে! আর তারই জন্তু এই ধ্বংসলীলা।

মিলিটারি গাড়ি চলে গেল। একটা, দুটো, তিনটে। শেষেরটা কামান বসানো!

আগুন জ্বলুক! কেউ নেভাবে না। হয়তো ঐ আগুনের মধ্যেই রয়েছে লাশ, ইস্মাইলের। শাহীনেরও থাকতে পারে। শাহীন

বাংলাদেশ কথা করি

ফিরেও আসতে পারে। জানি না, হু'জনে এক সাথে লড়তে
পেরেছে কি না, কিন্তু একা হয়ে লড়েছে নিশ্চয়ই।

আর নয় এখানে। আমারও ওদের মতই কিছু করা দরকার।
বহু ছাত্র-ছাত্রীর কাছে আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে বহু কথা বলেছি,
কিন্তু একটা কথা যেন কোনদিনই বলিনি। “যারা দেশকে ভাল-
বাসে, তারাই একমাত্র চরিত্রবান।”

বক্তৃত্ত্বে

আসক-উজ্জ-জামান

মুক্তি, আমি পালিয়েছি। দেশের জন্তে আমি সংগ্রাম করিনি। আমি ভীক, স্বার্থপর। আমি চরিত্রহীন। তাই তো তোমাদেরও কেলে রেখে চলে আসতে পারলাম। অথচ তুমি যখন মাতৃগর্ভে তখন তোমার ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তে কত পরিকল্পনাই না আমার ছিল। তোমার মায়ের সঙ্গে আমিও স্বপ্ন দেখেছি কী করে তোমার আগামী জীবনকে কুসুমাস্তীর্ণ করব আমি।

আয়োজনের অভাব ছিল না। তুমি যখন চোখ মেলে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলে তখন যদি তোমার বোঝবার ক্ষমতা থাকত তাহলে দেখতে আধ ডজন নার্স তোমাদের ঘিরে রেখেছে সর্বদা। তোমাদের সামান্যতম সুবিধাটুকু সর্বসত্তা দিয়ে মুছে দিতে তারা অক্ষুণ্ণ প্রস্তুত। ভেবে না, সেইসব নার্সরা তোমাদের ভালবেসেছিল, আসলে তার খুশী করতে চেয়েছিল আমাকে। পরবর্তীকালে তাদের চাহিদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবসায়ী পদ্ধতিতে তাদের নৈশুণ্য ছিল সন্দেহাতীত। আর আমি কি এসব করে-ছিলাম তোমাদের ভালবেসে? আমার স্ট্যাণ্ডার্ড উজ্জল রাখবার আত্মপ্রচারক অহমিকা সেখানে কি সক্রিয় ছিল না? জানি না। আমি একজন বুদ্ধিজীবী। তার মানে প্রজ্ঞাধান কোন প্রাতঃ-স্মরণীয় ব্যক্তি নই। বুদ্ধির সাহায্যে যতটুকু সুখ নিজের জন্তে

বাংলাদেশ কথা কর

ছিনিয়ে নেয়া যায় সবই ছিল আমার করতলে। একটি প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলাম আমি, অর্থাৎ আরও কয়েকটি বুদ্ধিজীবীর প্রভুর আসনে ছিলাম সমাসীন।

মুক্তি, এখন মুঘলধারে নেমেছে রুষ্টি। তোমাকে গোপনে জানাই আমার আবৃত দুষ্কৃতির কথা। আমি অনেক অবিচার করেছি আমার সহকর্মীদের ওপর স্তরে স্তরে উপরে উঠতে গিয়ে, সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে বিধ্বস্ত করেছি আমি। নিশ্চিহ্ন করেছি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছি, অথচ কোথাও কেউ হত্যার অভিযোগে বিচার চায় নি আমার। আমার প্রতি পর্বত-প্রমাণ ঘৃণা নিয়েও আমার অধীন কর্মীরা আমার জন্ত সেলাম সংরক্ষিত রেখেছে। কফির পেয়ালায় ঠোঁট ডুবিয়ে আমার চাইতে দুমুখ বন্ধুটিও আমার সবচাইতে ওঁচা মার্ক। গ্রন্থটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। অবশ্য বিরুদ্ধাচরণ যে ছিল তা নয়। আমার হুঁসিতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে যাচ্ছিল কোন এক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায়। সে কথা কেমন করে জানতে পেরে আমার ম্যানেজার দেখা করেন পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে। অমনি সম্পাদক বিগলিত হয়ে ত্রুটি স্বীকার করলেন, ব্যর্থ হ'ল নিন্দুক সত্যবাদীটির সমস্ত উদ্যোগ। জনসাধারণের কাছে আমার 'ইমেজ' অক্ষুণ্ণ রাখতে সেদিন আমার ম্যানেজার মারফত কি করতে হয়েছিল, সে কথা না-ই বা শুনলে।

মুক্তি, আমরা তোমার ঘর সাজিয়েছিলাম। তোমার খেলার ঘর, পড়ার ঘর, শোওয়ার ঘর। সে সব মূল্যবান আসবাব, বিদেশ থেকে বিশেষ আয়াসে সংগৃহীত দুর্মূল্য পুতুল ও খেলনাগুলো সম্পর্কে ভবিষ্যতে তুমি কিছুই জানতে পারবে না। সেগুলো এখন লুট করেছে লুটেরা। রূপকথার সে ঘরগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে হানাদার। খেলবার জন্তে একটি মাটির খেলনাও তুমি পাবে না এরপর।

মুক্তি, এখন অবিশ্রান্ত শ্রাবণ। চারিদিকে অন্ধকার ছিদ্রহীন, বাইরে
কাঁদছে গ্রামের আকাশ। খবরের কাগজের বিছানায় বিনা বালিশে
আমি শুয়ে আছি। ছাদের পচা বিচুলি চোয়ানো পানিতে ভরে
গেছে মেঝে। তা ছাড়া জেগে আছে অবর্ণনীয় মশার দল।
বাংলাদেশে যে এরা কখনও ছিল সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম,
আমার সুসজ্জিত বাংলায় তাদের-যে প্রবেশের কোন পথই ছিল না।
তথাপি এই দুঃসহ রাতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। বরং বুক ভেঙে
বেড়িয়ে আসতে চাইছে সত্যের মিছিল। একুশে ফেব্রুয়ারীতে
ঢাকায় যা প্রথম বেরিয়েছিল; তারপর কতবার জানালায় খড়খড়ি
তুলে ফুটপাতে তাদের আমি দেখেছি। এবং তৎক্ষণাৎ জানালা
বন্ধ করে তাদের নিপাত-মন্ত্র উচ্চারণ করেছি। হ্যাঁ, সেইসব বিগত
মিছিলের পথভ্রষ্ট এক অনিবার্ণ কণ্ঠ এইমাত্র আমাকে শুনিয়ে গেল
তিক্ত সত্য। আমি দেশদ্রোহী, দেশকে আমি কখনও ভালবাসি
নি, এমন কি আমার শিশুকন্যা মুক্তি তোমাকেও আমি ভালবাসি
নি কোনদিন।

এ কথায় চরম আঘাত পেলাম আমি। আমি যদি আমার কন্যাকে
না ভালবাসি তবে কার জন্তে করেছি এত সঞ্চয়! স্বপ্ন-মঞ্জিলে
রূপান্তরিত করেছি কার জন্তে আমার কুটির! দেশকে যদি আমি
ভাল না বাসি তবে কিজন্তে আমার কন্যার নাম রাখলাম মুক্তি!
আমি তো মুগ্ধ দেশের প্রধানতম ইচ্ছার স্পর্শ রাখছি এই নামে।
সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নির্ধাতন থেকে যে
দেশ ব্রিটিশ শাসন অবদানেও মুক্তি পায় নি, তার স্বরূপ উন্মোচিত
করেছি আমার প্রিয় কন্যার নামে।

উত্তরে অলৌকিক কণ্ঠ কি বললে, জানো? বললে যে; এ কথাই
নাকি আমি তোমার আঁকিকায় আহত সুধীজন মহলে গত
অক্টোবরে বলে বাহবা কুড়িয়েছি। অতিথিদের মধ্যে এ কথার

বাংলাদেশ কথা কয়

প্রতিক্রিয়া নাকি চমৎকার হয়েছিল। কেউ কেউ আমার দেশপ্রেম সম্পর্কে নাকি সব সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অথচ এই নামকরণের পশ্চাতে নাকি ছিল আমার ব্যক্তিগত আনন্দের স্বার্থ-পর উচ্চারণ। তথাকথিত স্বাধীন দেশের সমগ্র মুক্তি-আনন্দ যে আমার শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নিষ্ঠুরভাবে সংরক্ষিত এ কথাই আমি নিলজ্জভাবে প্রকাশ করেছি এ নামে।

যুষ্টিটা সাময়িক ভাবে থেমেছে। বিরক্তিকর কণ্ঠটি অন্তর্হিত এখন। তোমার কথা পুনরায় নির্বিঘ্নে ভাবতে পারি। তোমাকে এবং তোমার মাকে মার্চের প্রথম দিকে পাঠিয়েছিলাম তোমার নানাজীর বাসায়। ভেবেছিলাম অসহযোগ আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ রাজধানীতে যে-কোন মুহূর্তে নেমে আসা অনিশ্চিত বিপর্দয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে এর ফলে তোমরা। (তোমার ব্যবসায়ী নানাজীরও ড্রাইং-রুম পাশ্চাত্য কায়দায় সাজানো, তাঁর একমাত্র কন্যার প্রথম সন্তান তুমি)। শুনেছি সে শহরও এখন লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত। তোমরা যদি বেঁচে থাক তাহলে সুদূর মফঃস্বলের কোন গ্রামে আত্মগোপন করে আছ। আমার বিশ্বাস তোমরা মরতে পার না। মরতে পারে না আমার মুক্তি। (এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে বাংলাদেশের তরুণদের রক্তদানের স্বতঃফূর্ত দৃষ্টান্ত দেখে। সাম্প্রতিক মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য দৃঢ়তর করেছে আমার ধারণা)।

মুক্তি, একটি ভাল কথা শোনাতে পারি। বাংলাদেশে তোমার যে পিতা ছিল একজন কলঙ্কিত বুদ্ধিজীবী, বর্তমানে তার নবজন্ম ঘটেছে। তাই দেশ-সম্পর্কে সত্যি আমি আজ ভাবতে পারছি। আত্মপরায়ণতার সমস্ত কুহেলি অতিক্রান্ত একটি বিমল সূর্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি আমি। তাই আজ পেলাম অকৃত্রিম আনন্দের দুলভ স্পর্শ। মুক্তি, আমার প্রথম কন্যা। আমার প্রথম পবিত্র আনন্দ, তোমাকে ছাড়া এই উপলব্ধির ঐশ্বর্য আমি কাকেই

বা নিবেদন করব। আমি অনেক শরণার্থী শিবিরে ঘুরেছি, দেখেছি অনেক চেনা মুখ। দেখেছি অনেক বিদ্বান পলাতককে। কিন্তু নিদারুণ ক্রেশে জর্জরিত সত্তা তাদের এক অলৌকিক পরিতৃপ্তিতে উদ্ভাসিত। তাদের সন্ততির। গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ কলমকে তীক্ষ্ণ তলোয়ারে রূপান্তরিত করে অকুণ্ণ রেখেছে সংগ্রামের অনিবার্ণ মনোবৃত্তি।

এই ভোঁ সেদিন হাঁটতে হাঁটতে আমি প্রধান নগরীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। (আগে কার্, ছাড়া চলতে পারতাম না ; ড্রাইভার অনুপস্থিত থাকলে মাইল খানেক দূরের জরুরী কাজটাও অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এখন আমি বেশ হাঁটতে পারি। এর হাতেখড়ি হয়েছিল সীমান্ত পেরোনোর সময় একটানা দেড়শ মাইল হাঁটতে হাঁটতে)। হ্যাঁ, নগরীতে এসে আমার সংস্থার ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনিও এসেছেন এদেশে শরণার্থী হয়ে। দেখলাম, তিনিও একজন রূপান্তরিত মানুষ। মাসিক তিন হাজার টাকা ছিল যঁার সরকার-অনুমোদিত আয়, তিনি এখানে একটি তিন কুঠরির অন্ধকার ঘরে উঠেছেন ফ্যামিলি নিয়ে। যেখানে একদা ডজনখানেক চাকর শোভা বিস্তার করত, আজ সেখানে একজনও নেই, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত মেয়েরা ঘর মোছা থেকে শুরু করে বাইরের টিউবওলের থেকে পানি আনা পর্যন্ত সব কাজ করে চলেছে অক্লেশে। বিদেশে শিক্ষণ-সমাপ্ত তাঁর পুত্রটি রেশনের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকছে দীর্ঘ কিউতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঠিকমত খেতে-পরতে না পেয়েও অসন্তুষ্ট নয় আদৌ। সবাই সবকিছু মেনে নিয়েছে হাসিমুখে। গান্ধীঘের মুখোশটি হানাদার-অধিকৃত নিজবাসভূমে ইতিপূর্বেই বিসর্জন দিয়েছেন। বললেন, “জানেন, আমরা সবাই মেঝেতে শুই, আগে কষ্ট হ’ত, এখন আর হয় না।” ছোট ছেলে ও মেয়েটি

বাংলাদেশ কথা কয়

বললে, “কাকু, আমরা বড় হলে মুক্তিফৌজে যোগ দেব।” শিশুর এই অর্থহীন উক্তির মধ্যেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত সূর্যের মত সার্থক হয়ে উঠল আমার কাছে। কী ভালই না লাগল আমার। এই রূপান্তরিত পরিবারে জ্ঞানোন্মেষের প্রথম প্রহরে যেসব শিশু কৃচ্ছ-সাধনের অমোঘ মস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠেছে, ঘোবন-সমাগমে তারা গড়ে তুলবে অপরাজেয় এক-একটি মুক্তিবাহিনী। সমাজের কোনপ্রকার নির্ধাতনের শিকার হবে না তারা।

মুক্তি, আজ এই ভাবনা সমাপ্ত-বর্ষণ আকাশের মত আমাকে প্রশান্ত রেখেছে যে, তুমিও মানুষ হয়ে উঠছ কৃষক-কন্টার সঙ্গে, হয়তো বা গ্রামের গোয়ালঘরে। তুমি তোমার চারপাশে দেখছ মেহনতি মানুষদের মুখ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রকৃত মানুষ। তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। ইয়াহিয়া রক্তস্নান করেছে তাদের স্বামী-পুত্র-কন্টার উত্তপ্ত শোণিতে। তারা যখন কাঁদে তখন তা আবর্জনার আড়িনায় স্থল-পদ্মের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তারা যখন হাসে তখন তা হয়ে ওঠে অরণ্যযুখীর মত অশ্রু-করণ। তুমি এই শুচিস্নাত পরিবেশে নির্মল হয়ে ওঠে। তুমি এই সংগ্রামী মানুষের কাছে তোমার নামের তাৎপর্য শিখে নাও।

ভালই হয়েছে। আমার সাজানো বাংলা ভস্মীভূত হয়েছে। এবং তুমি ও আমি নির্বাসিত হয়েছি দুই প্রান্তে। আমার রক্তের শুদ্ধতম আনন্দে তোমার সৃষ্টি। ঈশ্বর আমার পাপকে তোমার মধ্যে পঙ্কজ করে তুলুন। তুমি গ্রামান্তের হাসাহানার মত অনাবিল আনন্দে প্রস্ফুটিত হও। মুক্তি, আমার সাজানো ড্রইং-রুমের সৌরভহীন মাধবীলতার পরিণামকে তুমি সৌভাগ্যবশতঃ এড়িয়ে যেতে পেরেছ। ওখানে প্রতিশালিত হলে বিষরুদ্ধে বিষফলের আবির্ভাবকে কিছুতেই রোধ করতে পারতে না তুমি। কখন তাৎপর্য হারাত তোমার নাম, তুমি জানতেও পারতে না।

আগস্টের আজ কত তারিখ জান? এক শুভার্থীর সৌজন্যে
প্রাপ্ত খবরের কাগজ থেকে আজই আমি তা জেনেছি এবং চমকে
উঠেছি। আজ তোমার প্রথম জন্মদিন। কে বললে, আজ কোন
উৎসবের আয়োজন হয় নি? দেখ না, শ্রাবণ-আকাশ অরণ্য ভরে
বাজিয়ে চলেছে সেতার, বন থেকে মল্লিকা পাঠাচ্ছে অফুরন্ত
সুবাসের উপহার, আর জোনাকিরা আলোর মালা গাঁথে রেখেছে
তোমার জন্যে। কিন্তু এত জল কেন আকাশে? শ্রাবণ কি কাঁদছে।
তোমরা কোথায় আছ জানি না। আমার বিশ্বাস তোমরা
কোথাও না কোথাও আছ তোমার 'মুক্তি' নামই তার প্রমাণ।
তোমার এই নিঃসম্মল জনকের শুভেচ্ছা ব্যর্থ হবে না। তোমাকে
মারবার শক্তি ওদের নেই। ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশের
উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে নির্মিত হয়ে ওঠবার জন্যে আজকের
বিনষ্ট বর্তমানের শ্রাবণ-রজনী-শেষে প্রত্যাশন্ন অরুণিয়ার মত বেঁচে
তোমাকে থাকতেই হবে।

গোপেন্দ্রনাথ

বুলবন ওসমান

[বাংলাদেশ কথা কয়। কইছেই তো! পহেলা মার্চ থেকে, থেকে থেকে কি ছুজয়, কি কাকুতিতে, চোখের জলে, হতাশায়, আশঙ্কায়, দপ করে জলে উঠে, একেবারে ভেঙে পড়ে, শেষনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে, এল. এম. জি. নিয়ে টররররর, হ্যাণ্ড-গ্রেনেড নিয়ে দম করে ফেটে পড়তে পড়তে...বাংলাদেশ কত ভাবে কথা কয়। তবে বাংলাদেশ নিয়ে গল্প লিখতে হবে কেন? প্রতিটি দিন লোক তো এক একটা জীবন্ত গল্প হয়ে রয়েছে, তবে আর গল্প বানানোর জন্তে মাথা ঘামিয়ে লাভ? বরং একটা সত্যি ঘটনা লিখি। সত্যি ঘটনা লেখা নানাভাবে অবাঞ্ছনীয়। এবার একটা অবাঞ্ছনীয় কাজ করি। শুধু শুধু গল্প লেখার লোভে পাত্র-পাত্রীর নাম পাণ্টে বাহাছুরি নেবার দরকার কি!]

প্রকাশক অচ্যুত কাকা যখন সন্মুখে বললেন, ভাতিজা, গল্প যদি দিতে চাও পাঁচ দিনের মধ্যে দিতে হবে। পানসে গল্প দিও না। নিউ জেনারেশন, নতুন গল্প চাই।

তখনো কিছু ভাবি নি। সম্পাদনায় আছেন গাফ্ফার ভাই। তিনি বললেন, পহেলা মার্চ থেকে শুরু করে এর পরের যে-কোন ঘটনা নিয়ে গল্প হলেই চলবে।

অচ্যুত কাকা পানসে গল্প গ্রহণে নারাজ। কাকাবাবু এই রচনাটা পানসে হবে কি না জানি না, তবে এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা এবং এই সুবাদে যুক্তির ফাঁকটা গ্রহণ করছি।

গাফ্ফার ভাই, পহেলা মার্চ পর্যন্ত সময়ের চৌহদ্দিকে বাড়িয়ে আপনি আন্দোলনের পটভূমিকেও গল্পের এয়ারেনায় আনতে চান।

সোলেমান ভাই

বলতে যাচ্ছি, পঁচিশে মার্চের আরো এক মাস পরের। ঘটনাটা ঘটে ছান্ধিশে এপ্রিল মধ্য-রাতে। সম্পাদনার যখন আপনার নাম যাবে দায়-দায়িত্ব আপনার যথেষ্ট। সত্যি ঘটনা আপনার কোন বদনাম ডেকে আনবে কি না, এ-ব্যাপারে আপনাকে কঠোর হতে পারে। গল্পের শিরোনামায় নিশ্চয় দেখেছেন একটি নাম এবং তারপর একটি সম্বোধন। যেমন আপনাকে বলি, ভাই, তেমনি ভাই। আপনার সঙ্গে যেমন কোন আত্মীয়তা নেই, অথচ আত্মীয়তা, সোলেমান ভাই ছিলেন তেমনি আত্মীয়। তাঁর আত্মীয় স্বজন কি বলবেন? বা কোন মন্তব্যে যদি বিরূপ হন? সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। আপনি এ-ব্যাপারে একেবারে মুক্ত।]

সোলেমান ভাই সম্বন্ধে বলতে গেলেই তাঁর অনুজ হাশেম খানের কথা এসে যায়। সহকর্মী বন্ধু হাশেম খানের বড় ভাই সোলেমান খান। হাশেম খানের মাধ্যমেই সোলেমান ভাইয়ের সাথে আলাপ। আপনি তো হাশেম খানকে চেনেন : শিল্পী হাশেম খানের তুলিস্পর্শ না পেলে কোন কিশোর বা শিশুশাঠ্য বই বেরোয় না ঢাকা থেকে, সেই হাশেম খান, বংশগত ভাবে ষাদের টাক, হাশেমের ঠিক পুরো টাক পড়েনি, মাথার চুল গেছে ভীষণ ভাবে পাতলা হয়ে, মাথার চারপাশে অবশ্য চুল এখনো ঘন, বাবরির রূপ নিয়েছে, সেই হাশেম খান, যার সাথে কদম মিলিয়ে চলা বেশ কষ্টসাধ্য, গোলগাল ফর্সা চেহারা, মধ্যম উচ্চতার সেই হাশেম খান, আপনি কল্পনা করতে পারেন, সেই হাশেম খান এখন ঢাকার রাস্তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে! পায়ের ঘা এখনো শুকোয় নি। আপনি দেখেন নি। আমি দেখি নি। পঁচিশে মার্চের পর তার সাথে আমার আর দেখা হয় নি।

প্রশ্ন করবেন, হাশেম খান খোঁড়াচ্ছে কেন?

হ্যাঁ, ওটা বের করতে গেলেই সব ঘটনা বেরিয়ে পড়বে। আলোচনাটা তখন সোলেমান ভাইকে কেন্দ্র করবে। হ্যাঁ, হাশেম

বাংলাদেশ কথা কয়

খান কেন খোঁড়াচ্ছে। হাশেম খানকে তো সারা জীবনই এখন খোঁড়াতে হবে, ও নিয়ে ছুঁখ করে লাভ নেই বরং সোলেমান ভাই সম্বন্ধে কিছু বলি।

বন্ধুর বড় ভাই—স্বভাবতই একটা সমীহমাখা দূরত্ব থাকে। ছিলও। কিন্তু দেখা হলে ও আলাপ-আলোচনা কালে কোথায় একটা সৌহার্দ্য বার বার ঘুরপাক খেয়ে আমাদের জড়িয়ে চলত। পেশায় ডাক্তার, নেশায় রাজনীতি। ডাক্তার হিসেবে কেমন ছিলেন সে সব অবান্তর, রামকৃষ্ণ মিশন রোডে, রাশেদ মেডিক্যাল স্টোরে ছিল তাঁর চেম্বার। চেম্বারে ছোটো টেবিল পাতা। বাঁয়েরটা দোকানের মালিক-ম্যানেজার মৌলবী সাহেবের। ডানের টেবিলে সোলেমান ভাই। টেবিলের উপর তাঁর সেই চামড়ার ব্যাগটা, যা প্রায় সব ডাক্তারেরই থাকে, থাকে এক পাশে। আর ঠিক সোলেমান ভাইয়ের মুখোমুখী প্রিজম আকৃতির কাঠফলকে তাঁর নাম লেখা। চাকরি করতেন। তাই সকালে বুঝি খুব অল্পক্ষণ বসতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে চেম্বারে নামফলকটি তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করত। জানি না, এখন রাশেদ মেডিক্যাল স্টোর খোলে কি না? ওষুধের দোকান এখন, নিশ্চয় খোলে। সেই কাঠফলকটা নিশ্চয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হয়তো অন্য কেউ সে জায়গা দখল করেছে বা সে আসন শূন্য।

হাশেম খানের বাসা পঁচিশ নম্বর গোপীবাগ, তৃতীয় গলি, সন্ধ্যায় ওর বাসায় যেতে গেলেই রাস্তায় দেখা হ'ত সোলেমান ভাইয়ের সাথে। চেয়ারে বসে আছেন। চারদিকে রোগী বন্ধু পরিবেষ্টিত। মুখে হাসি লেগেই আছে। সেই হাসিটাকে আর একটু প্রসারিত করে সোলেমান ভাই সামান্য নড় করে আমার সালামের প্রত্যুত্তর

দিতেন। কোন কোন দিন প্রশ্ন ছুঁড়তেন, কি, ভালো?

জী। হাশেম বাসায় আছে, বলতে পারেন?

আমি খেয়াল করি নি, আপনি নিজেই দেখে আসুন।

আচ্ছা, চলি।

পরে আসবেন।

জী আচ্ছা।

তারপর হয়তো আবার নিজের আলোচনায় ফিরে যেতেন, চার পাশে যারা ঘিরে আছে তারা হয়তো উৎসুক হয়ে রয়েছে কখন আবার আগে আলোচনায় ফিরবেন। লোক জমিয়ে, গুছিয়ে বলা এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতার বলে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা অপরিসীম ছিল সোলেমান ভাইয়ের। দীর্ঘদেহ, চাপা রঙ, মাথায় বিরল কেশ, প্রশস্ত বক্ষ, পেশীবহুল ভারী শরীর, দেখে মনে হয় কখনো বুঝি শারীরচর্চা করতেন। জানি না করতেন কিনা, তবে তাই মনে হ'ত।

সোলেমান ভাইয়ের সামনে চেয়ারগুলো কখনো খালি দেখতাম না। নতুন রোগীর চেয়ে পুরনো রোগীর ভীড় বেশী। আর গোপীবাগের সবরকম বয়স ও স্তরের লোকের ভীড়। গরীব রোগীদের আবদার আরো বেশী। একবার যে বুঝে ফেলেছে ডাক্তার সাহেব ভালো মানুষ, গরীবদের জন্যে টান, আর ছাড়ে? ফিস্ লাগছে না, ওষুধের দাম কম পড়লে মৌলবী সাহেবকে বলে নানাভাবে ব্যবস্থা করে দেওয়া, কে দেয়! ডাক্তারী পেশার একটা সুবিধে আছে। অনেকেই কথা শোনে। কথাটা আমার নিজের মনে হলেও সোলেমান ভাই নিজেও এ-কথা বলছিলেন।

বুঝলেন, নানা রকম লোক আসে, আর ডাক্তারদের কথার একটা দাম আছে। আমি তাই আমার কাজ করে যাই, সুযোগ পেয়েই লোককে বোঝাতে চেষ্টা করি।

বাংলাদেশ কথা কয়

ঠিক বলেছেন, আপনাদের এই একটা সুযোগ আছে।

হ্যাঁ, এবং সদ্যবহার করি। আগের তুলনায় মানুষ এখন অনেক রাজনীতি-সচেতন হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামের ভিতটা তারা এখন বুঝতে শিখেছে। অন্তত শিল্প এলাকাগুলো এ-ব্যাপারে বেশ এগিয়ে গেছে। তবে গ্রামগুলো নিয়ে এখনো মুশ্কিল।

যা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ? বড় স্লে। তবে রাস্তা-ঘাট আর যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন সম্ভাবনাটা আরো বাড়ছে। অন্তত রোজকার খবরের কাগজটা যদি যায় তাহলেও অনেক কাজ হবে।

আমরা কথা বলছি, এমন সময় উনিশ-কুড়ি বছরের এক শ্রমিক যুবক এসে প্রেসক্রিপশন বাড়িয়ে দেয়।

ডাক্তার সাহেব, এই ওষুধটা আর খাব?

না, কোন দরকার নেই। এখন এমনিতে কেমন লাগছে?

একটু দুর্বলতা আছে।

ও দু'তিন দিন বিশ্রাম নিলেই ভালো হয়ে যাবে।

ভাবলাম, এবার চলে যাবে যুবক শ্রমিক। আমরা আবার নিজেদের আলোচনায় আসব। কিন্তু না, ছেলেটি একটা চেয়ারে বসে পড়ে। এবং বোঝা গেল এখনি তার ওঠার ইচ্ছা নেই। আর লোভটা কি তা-ও বোঝা যায়, সোলেমান ভাইয়ের আলোচনা শোনা।

রাজনৈতিক একটা দল-সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন তুললাম।

আচ্ছা সোলেমান ভাই, এই দলকে আপনারা প্রগতিশীল দল হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু তার সেক্রেটারি ও অন্যান্য উপনেতারা তো এক একজন বুর্জোয়া। এদের কেমন করে বামপন্থী দল বলেন? ঠিক বলেছেন, এরা সুবিধেবাদী দালাল। যুবক-শ্রমিক আমার কথার মাঝেই হেঁকে ওঠে। এরা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। বেশ উত্তেজিত স্বর যুবকের।

সোলেমান ভাই

সোলেমান ভাই ছেলেটার দিকে একবার তাকাল, তারপর দৃষ্টি দেয় আমার ওপর।

হি ইজ ভেরি মাচ, রাইট। এটা ও এমন কিছু লেখা-পড়া শিখে বোঝে নি, তার ভেরি ইন্সটিক্ট্ দিয়ে বুঝেছে। দিন দিন রাজনীতি এমনি ভাবে মানুষের রক্তে গিয়ে দানা বাঁধছে।

চারদিকের চেয়ার তখন একটাও খালি নেই। কয়েক জন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার আধো অন্ধকার কাটানর জন্যে বাতি জ্বালেন মৌলবী সাহেব।

সোলেমান ভাই, যে-কথা বলছিলাম পার্টির কথা....

হ্যাঁ, সত্যিকার অর্থে 'ও তো' আর শ্রেণীসংগঠন নয়। তবে এর মাঝে প্রগতিশীল কর্মীরা কাজ করতে পারছে।

তবু লোক-বাছাই বিশেষ করে সেক্রেটারি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে যাদের নেওয়া হবে, তাকে নিশ্চয় শ্রেণীচরিত্রের দিক দিয়ে লোকে বিচার করবে!

নিশ্চয় করবে। এ-ক্ষেত্রে হয়তো সিলেকশনটা ঠিকও হয় নি, তবে ক্যামুফ্লাজ্ হিসেবে এটা ভালো সার্ভিসও দিতে পারে।

কিন্তু সাধারণ লোক তো অত বুঝবে না।

না, এখানে একজন ব্যক্তিকে না ধরে পার্টির নিজস্ব বক্তৃতাটা তাদের বোঝান হবে।

কিন্তু এ-প্রশ্ন এড়াতে পারবেন না।

হয়তো আপনি ঠিক। তবে এই সমাজ-ব্যবস্থায় খাঁটি কিছু গড়ে তোলা মুশ্কিল। ঐ জোড়াতালি কিছুটা স্বীকার করে নিতে হবে।

এদিকে ভীড় তখন আরো বেড়েছে। মৌলবী সাহেব একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। আসল ব্যবসায় তাঁর ব্যাঘাত ঘটছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার উঠে পড়া উচিত। তাই বলি—সোলেমান ভাই, এখন উঠি।

বাংলাদেশ কথা কয়

আরে বসেন, বসেন।

এ ডাক উপেক্ষা করে ওঠা দায়। দাঁড়িয়ে আবার বসতে হয়।

এই সময় একটা ছেলে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল। বললে—ডাক্তার সাহেব, আক্কা পাঠিয়ে দিলেন, আমাদের খুব শরীর খারাপ, আপনি এক্ষুণি একবার চলুন।

আচ্ছা, তুমি যাও, আমি আসছি। উঠে দাঁড়ালেন সোলেমান ভাই। ব্যাগে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ভরে আমাদের বললেন, আপনি বসতে পারেন, এই কাছেই বাসা। ফিরতে বেশীক্ষণ লাগবে না। থাক, চলি। হাশেম ফিরল কি না আর একবার দেখে যাই। আচ্ছা।

ছ’জন এক সাথেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ি। ভারী পায়ে সোলেমান ভাই ডানে এগিয়ে গেলেন, আমি সোজা পা চালাই।

আর একদিনের ঘটনা। উনসত্তুরের অক্টোবর। শরতের উজ্জ্বল দিনে হঠাৎ অভিষাপ নেমে এল। হঠাৎ বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গা বাধার উপক্রম। শেখ মুজিব তাঁর লগুন সফর সংক্ষিপ্ত করে ছুটে এলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্তে। সেই তখনকার এক সন্ধ্যায় সোলেমান ভাইয়ের সামনে বসেছি রাশেদ মেডিক্যাল স্টোরে।

দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা। সোলেমান ভাই আশাবাদ ভরা কণ্ঠ নিয়ে বললেন—দেশের যুবশক্তিকে অনেকেই দেখতে পারে না, তাদের লম্বা জুলফি আর বেলবটম প্যাণ্টের জন্তে, কিন্তু সত্যিকার ভাবে যুবশক্তির বড় অংশটা এখন বেশ সংগঠিত। গতকাল বুঝলেন, রাত বারোটার দিকে এক রোগী দেখে তাদেরি গাড়ি করে বাড়ি ফিরছি : নয়। পল্টনে, জোনাকি সিনেমা হলটার সামনে একদল ছেলে আমাদের গাড়ি দাঁড় করাল। প্রথমে আমি ভয় পেয়ে

সোলেমান ভাই

গিয়েছিলাম। শুধু দাঙ্গার ভয়ই তো নয়, চুরি-ডাকাতিও হঠাৎ খুব হচ্ছিল তখন। একটি ছেলের মাথায় হেলমেট, গায়ে থাকি পোশাক, গলায় মাফলার জড়ান, হাতে পাঁচ ফুট এক লোহার রড। পুলিশি ছইসেল কোমরে ঝুলছে। হন্ট! বলে ছেলেটা হাত তুলে সামনে এসে দাঁড়াল।—কোথায় যাবেন? গলায় কম্যাণ্ড। আমি সব খুলে বললাম। কথা বলতে বলতেই আরো চার-পাঁচ জন ছেলে এসে জড়ো হয়েছে। সবাই একই পোশাক। চোর-ডাকাত বলে যে-ভয় পেয়েছিলাম সে ভয় তখন নেই। ওরা বললে, আমরা পাড়ায় পাড়ায় এ-ভাবে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে তুলছি। চুরি ডাকাতি, গুণ্ডামি, দাঙ্গা আমরা সমূল উৎপাটন করে ছাড়ব। খুব ভালো লাগল ছেলেদের উৎসাহ ও দৃঢ়তা দেখে। বাংলার সেই দৃঢ়চেতা ছেলেরা আজ মুক্তিফৌজ।

আর একদিন। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখি দরজার পাশায় লেগে মায়ের কপাল গেছে কেটে।

কার কাছে যাওয়া যায়? প্রথমেই মনে পড়ল সোলেমান ভাইয়ের কথা। রিক্সা নিয়ে রওনা দিই। সব বর্ণনা করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে দু'জনে ফিরতি যাত্রা করি।

যত্ন-সহকারে সোলেমান ভাই ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

তারপর চা খেতে খেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক গল্প।

ফেরার সময় মা বললেন, বউকে নিয়ে এস বাবা।

জী আসব। আপনিও যাবেন।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছি। রিক্সা ধরব।

বাংলাদেশ কথা কয়

আমি এদিকে পড়েছি বেশ মুস্থিলে। ফিস্ বা দর্শনী হিসেবে কিছু একটা দেওয়া দবকার। তিনি নীরব। জানি, তিনি নীরবই থাকবেন। আমি কিতাবে কথাটা পাড়ব ভেবে পাই না। একে বড় ভাইয়ের মত, এদিকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর দাদা—শেষে একটু ঘুরিয়ে বললাম, সোলেমান ভাই, আপনার কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের থেকে টাকা নেওয়া উচিত। হাজার হলেও বাবসা তো।

হ্যাঁ, নেওয়াও উচিত। খুব সহজ ভাবে বললেন। যেন এতদিন নেওয়াই উচিত ছিল।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। চট করে বলি—ভাই, আপনার রিক্সা ভাড়াটা নিন। বলে পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিই।

সোলেমান ভাই দাঁড়িয়ে পড়ে স্থিত হাসলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সহজ ভাবে টাকাটা গ্রহণ করে আমাকে দায়মুক্ত করলেন।

এই গত ফেব্রুয়ারির বকর-ঈদের দিনের কথাটা আজো স্পষ্ট মনে পড়ে। ছপুর্নে হাশেমের বাড়িতে দাওয়াত। রফিকুন নবী, শাহাদাত চৌধুরী, মাহবুব তালুকদার আর আমি, বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এমন সময় এলেন সোলেমান ভাই। ঈদের কোলাকুলির শেষে যথারীতি এসে গেল রাজনীতি।

আওয়ামী লীগ কবে ক্ষমতায় যাচ্ছে সেই নিয়ে হচ্ছিল আলোচনা। তার মাঝেই উঠল স্বাধীন বাংলার প্রসঙ্গ। একমাত্র মওলানা ভাসানী তখন লাহোর প্রস্তাব-অনুযায়ী পাকিস্তানের সংবিধান রচনা নিয়ে হেঁচো শুরু করেছেন। কখনো স্বাধীন বাংলার কথা বলেন, কখনো বলেন অস্ত্র কথা।

সোলেমান ভাই তাঁর স্বভাব-স্থলভ ভাব নিয়ে বললেন,—স্বাধীন হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের উপায় নেই।

কে যেন বললে— কেন, কনফেডারেশন হলে তেমন বাধা থাকছে না। না, তবু গণ্ডগোল আছে। প্রথম, সামরিক খরচা থাকছে কেন্দ্রে, এবং কেন্দ্র থাকছে পশ্চিমে, সুতরাং লাভটা কাদের? দ্বিতীয়, একটা সম্পূর্ণ জাতি সব সময় কেন্দ্রের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে, অর্থাৎ বাঙালীরা বঞ্চিত ঠিকই হবে। এর চেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল, এদেশে সমাজতন্ত্র আসবে না স্বাধীন না হলে। কারণ পশ্চিমে এখনো সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর প্রভাব। এখানে সমাজ-তান্ত্রিক সরকার করতে গেলেই কেন্দ্র থেকে বাধা আসবে। কেন্দ্রে বাঙালী শাসন থাকলে সামরিক অভ্যুত্থান হবে। সুতরাং উপায় নেই।

কিন্তু এ-কথা উচ্চারণ করবে কে? আমি বলি।

উচ্চারণ আমাদেরই করতে হবে।

কিন্তু বললেই তো গুলি চলবে।

চলতে পারে, তবু এটা বলতেই হবে আমাদের। আর এখনই ঠিক সময়। দেশের মানুষ এখন যথেষ্ট সচেতন হয়েছে এবং ভূমি তৈরী। প্রথমে ছ'একটা ছোটখাট মিটিং-এ বসে পরে বড় জন-সমাবেশে এ-কথা বোঝাতে হবে। কোন আন্দোলন করতে গেলেই কষ্ট সহ্য করতে হয়। সুতরাং ভয় পেলে তো চলবে না।

মাত্র ক'দিন আগের ভাবনা। সোলেমান ভাই যা ভাবছিলেন তা দিন পনের না যেতেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সারা দেশকে ভাসিয়ে নিল। এর ফল হিসেবে পঁচিশে মাচ' রাতে হাজার হাজার লোক প্রাণ দিল। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বলি হ'ল।

পঁচিশে মাচের কালো রাতের পর ঢাকায় জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দশ-পনের দিন পর আবার কিছু কিছু লোক পেটের তাগিদে ফিরে আসতে থাকে।

বাংলাদেশ কথা কয়

হঠাৎ একটা নতুন বিপদ দেখা দেয়। প্রথমে কথাটা গুজবের মত রটে। পরে সেটা বেশীর ভাগ লোকের মনে হয় সত্যি। তাই ভয় দানা বাঁধতে থাকে। শোনা গেল, বাঙালী আর দাখা হবে না শহরে। অবাঙালীদের উল্লেখ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

শহরে বাঙালীদের মধ্যে এই এক আলোচনা।

ভাই, এক মসিবত কাটতে না কাটতে আবার কি এল! ওদের তো আর ভয় পাই না, কিন্তু পেছনে মিলিটারী হারামজাদারা আছে, তাইতো ওদের পোয়াবারো!

কি হবে ভাই, সত্যি হবে নাকি?

কি জানি ভাই, কিছু বুঝতে পারছি না। তবে সামরিক কতৃপক্ষ কি এ-রকম একটা ব্যাপারে অনুমতি দেবে। ঢাকা যখন তারা নর্ম্যাল রাখতে চায়।

কে জানে। হয়তো অবাঙালীদের পুরোপুরি দলে টানার জন্ত এই সুযোগ দিতেও পারে। ওদের দিয়েই দরকার হলে বাঙালীদের শাসাবে। নিজেরা থাকবে নেপথ্যে আড়াল হয়ে।

কুড়ি তারিখের পর আবার ঢাকা শহরের লোক কমতে শুরু করে। সামরিক কতৃপক্ষ গুজবে কান দিতে নিষেধ করা-সত্ত্বেও। ভ্রমশ্রমকে বিশ্বাস করতে নেই। ঢাকা শহরে যা-ও বা লোক ফিরেছিল, সপরিবারে আবার অর্ধেক খালি।

পঁচিশে এপ্রিলের উৎকণ্ঠাময় রাতটা পার হতে সবাই স্বস্তি পায়। লোকজন আবার ফিরতে শুরু করে। কিন্তু যেটা ঘটা করে পঁচিশ তারিখে হবার কথা, তাই আচম্বিতে আটশ তারিখে ঘটে গেল। তিনশ বাঙালী খুন হ'ল! বাঙালী মাত্রেই মুখ বিষাদের মসীতে লেপা। এ-দেশে আর বাস করা যাবে? সবার চোখে-মুখে এক প্রশ্ন। গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিল এরা।

সোলেমান ভাই

ছপুৰে অফিস থেকে ফিরে আমার মেজবাই বর্ণনা করল, কি-ভাবে বাস এবং কোচ-সার্ভিস থেকে লোক নামিয়ে নামিয়ে জবাই করা হয়েছে। এরপরই আর একটা কথা বললে যা শোনার জন্যে আমি মোটেই তৈরী ছিলাম না।

বললে—শিল্পী হাশেম খান নাকি গুরুতর আহত।

আমি বলি—জানি না তো! ওরা তো গ্রামে চলে গেছে।

ব্যাপারটা ঘটেছে গ্রামে। ওদের কে একজন মারাও গেছে।

তাই নাকি। কি ব্যাপার।

তা ঠিক জানি না। ওদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আমাদের অফিসে কাজ করে সে বললে। তবে পুরো ব্যাপারটা ঠিক জানে না। তখনি হাশেমের বাসায় যাব কিনা ভাবছি। শহরে ভীষণ উত্তেজনা। রাস্তা জনমানবশূন্য। ঘর থেকে বেরুতে সাহস পেলাম না। তা-ছাড়া ওদের বাড়িতেও কেউ নেই। কাউকে না পাওয়া যাবারও সম্ভাবনা। মনটা বিষাদে গুমরাতে লাগল। আরো কত কি দেখব, ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

পরদিন সকালে জামা-কাপড় পরছি, মা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় বেরুচ্ছ?

একটু হাশেমদের বাসায় যাই। দেখি, দরকার হলে চাঁদপুর যেতে হতে পারে! চাঁদপুর হাসপাতালে কি রকম ব্যবস্থা কে জানে। কদিন আগে চাঁদপুরে বন্ধিং হয়েছে।

— সাবধানে যেও।

তখনো শহরে ভীতি ও উত্তেজনা। গত রাতেও চলেছে দাঙ্গা হাঙ্গামা। একটা রিক্সা নিয়ে রওনা দিলাম।

বাংলাদেশ কথা কয়

কাঁকা রাস্তা পেয়ে রিক্সা বেশ অল্পক্ষণেই এসে দাঁড়ায় গোপীবাগ তৃতীয় গলির পঁচিশ নম্বরের সামনে। ফটকের দরজা ভেতর থেকে লাগান নেই। হাত দিতেই খুলে গেল। কোন জনমানবের সাড়া পেলাম না। দরজা-জানলা সব বন্ধ। রান্নাঘরের দরজা শুধু খোলা মনে হ'ল। টুকটাক শব্দও পেলাম। এগিয়ে গিয়ে বলি—কে আছে। দেখি আমাদের আর্ট কলেজের পিওন হালিম।

হালিমকে জিজ্ঞেস করি—তুমি ছাড়া হাশেমদের কেউ আছে ঢাকায়?

না। হাশেম ভাইদের খবর শুনছেন?

শুনেছি। তবে পুরো খবর কিছু জানি না।

ঘরের দরজা খুলে হালিম আমাকে বসতে দিল। তারপর যা শুনলাম তা শুনতে ওখানে আমি যাই নি।

হালিম যা খবর দিল তা নিম্নরূপ :

পঁচিশে এপ্রিলের কয়েক দিন আগে হাশেম ঢাকায় আসে। সোলেমান ভাই আর ভাবী ছিলেন ঢাকায়। হাশেম, ভাই আর ভাবীকে গ্রামে যাবার প্রস্তাব দেয়। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বুঝি ভাই রাজী হয়। গ্রাম থেকে ঘুরে আসা যাক।

ছায়াংশে এপ্রিল রাতে একদল স্থানীয় ডাকাত ওদের বাড়ি আক্রমণ করে। তার আগেই হাশেমকে একজন ডাকাত সাবধান করে দিয়েছিল, আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন—আপনাদের বাড়ি বিপদ আসতে পারে। সবাই কথাটায় ভয় পেলেও সোলেমান ভাই তেমন আমল দেন নি। হয়তো বলেছিলেন, আছে তো

শ' তিনেক টাকা। আর আমরা এমন কিছু বড়লোক নই যে আমাদের বাড়ি ডাকাতি হবে।

কিন্তু ডাকাতির ধরণ দেখে মনে হ'ল এ তো শুধু ডাকাতি নয়। এর পেছনে মুসলিম লীগ পাণ্ডার হাত আছে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে রাইফেলধারী প্রথম ডাকাত। একমাত্র সোলেমান ভাই একটা চেয়ারে বসেছিলেন। বাকী সবাই কামরার এক কোণে জড়াজড়ি করে বসে। রাইফেলধারী ডাকাত ঘরে ঢুকতেই সোলেমান ভাই নির্ভয় চিন্তে বললেন—দেখুন, মেয়েছেলেদের গায়ে হাত দেবেন না, টাকা-পয়সা যা আছে আমি বের করে দিচ্ছি। বলে তিনি শুধু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় রাইফেলধারী ডাকাত পেছনের একজন ডাকাতকে জিজ্ঞেস করে—কোন্টারে? পেছনের ডাকাত আঙুল বাড়িয়ে সোলেমান ভাইকেই দেখিয়ে দেয়—এইটা।

চব্বিশে মার্চ রাতেও গোপীবাগের এক জনসভায় সোলেমান ভাই সভাপতিত্ব করেন। বোঝা গেল প্রগতিবাদী রাজনীতিই তাঁর কাল হ'ল।

ডাকাতের রাইফেল গর্জে উঠল। সোলেমান ভাইয়ের ডানবুক বিদ্ধ করে বুলেটটা কোণায় বসে থাকা সোলেমান ভাইয়ের মা, ভাগনি আর হাশেমকে আহত করে।

হাশেমের পায়ের নলি বিদ্ধ হয়।

এখন বুঝতে পারছেন, হাশেম খান কেন খুঁড়িয়ে চলে।

ডাকাতরা বেরিয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। হাসপাতালে নিতে হবে। একজন দৌড়াল নদীর দিকে, কোন নৌকো পাওয়া গেল না। কয়েক দিন আগেই চাঁদপুরে বসিৎ

বাংলাদেশ কথা কয়

হয়েছে, সুতরাং লোকজন রাতে প্রায় বেরুতেই চায় না। তার উপর এই এত রাতে কে যেতে চাইবে চাঁদপুর। যা এখন ভূতুড়ে শহর!

গুলিবিদ্ধ হয়েও সোলেমান ভাই ছ'ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। পুরো জ্ঞান ছিল। নিজের কথা বাদ দিয়ে শুধু হাশেমের কথা বার বার জিজ্ঞেস করেছেন। ছাত্র হিসেবে ভালো ছিল হাশেম খান। সেই ছাত্র বয়সেই ছবি এঁকে সংসারের বিরাট দায়িত্ব বহন করতে শুরু করে হাশেম। এমন কি বড় ভাইয়ের ডাক্তারি পড়ার খরচ পৰ্যন্ত বহন করেছে। হাশেমের প্রতি সোলেমান ভাইয়ের অগাধ স্নেহ। তাই থেকে থেকে শুধু হাশেমের কথা। এখনো ছোট ভাই-বোনেরা হাশেমের দায়িত্বে লেখাপড়া শিখছে। সোলেমান ভাই নিজেই বলে দিতে লাগলেন কার কি রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু নিজের ব্যাপারে কিছুটা যেন উদাসীন।

ছ'ঘণ্টার পর নৌকো না পেয়ে যখন ঠিক হ'ল একটা তত্তপোষে শুইয়ে সোলেমান ভাইকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তিনি সবাইকে নিষেধ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, বললেন, আমি আর বাঁচব না, তোমরা মিছে কষ্ট কোরো না।

এ-কথার মাঝে সত্য থাকলেও এর পেছন একটা ক্ষুর অভিমান কি যন্ত্রণাদঙ্ক বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল? তিনি জানতেন, এই ডাক্তাররা কাদের অঙ্গুলিনির্দেশে কাজ করছে। কথাটা ভাবতেই হৃৎপিণ্ডটা হয়তো ভীষণ ভাবে মুচড়ে উঠেছিল, চোখের কোণা দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল রক্ত, আর প্রাণবায়ু? বায়ুসমুদ্রে তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

নীল নবুশা

কামাল মাহবুব

পাট গাছের পাতাগুলো ঈষৎ নড়ে উঠল।

আসর নামাজের অজুর জন্তে দীঘির ঘাটে এসেছিল আবিদ আলী। ঘাট জনমানবশূন্য। আজকাল এখানেও একা আসতে বুকের ভিতরটা ছিম্ছিম করে। ভয়ে না অস্বস্তিতে, ঠিক বোঝা যায় না। অথচ এ গাঁয়ে ছদ্মান্ত প্রতাপশালী লোক বলতে, সে ছাড়া আর কে আছে? এককালে জাঁদরেল বি-ডি মেস্বার ছিল, চেয়ারম্যান সাহেব পর্যন্ত তার কথায় উঠতেন বসতেন। চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খালি হাতে সে হিন্দু পাড়া শাসিয়ে এসেছে, কিন্তু ভয়ের নামগন্ধ কোনদিন টের পায় নি। না, ও কিছু নয়, আপন মনে নিজেকে বুঝিয়ে দাড়িতে হাত বুলাল আবিদ আলী। ছ'মাণের খচখচে দাড়ি, এত তেল মেখেও মোলায়েম হ'ল না। ভারী বিন্ধী লাগত প্রথমে। এখন যা-ই হোক মনে একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। আয়নার দিকে তাকিয়ে আবিদ আলী দেখেছে, দাড়িসুদ্ধ চেহারা-খানা আর যা-ই হোক কাফেরদের মত নয়। ওর বাপ দাদারা নিশ্চই খাস আরব থেকে এদেশে এসেছিলেন, নইলে নাকটা পাঠানদের মত এত খাড়া হ'ত না। আরেকবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে অজু করতে ঘাটে নেমে গেল সে।

পাট গাছের পাতাগুলো আবার নড়ে উঠল।

মুখে কুলি করতে যাচ্ছিল আবিদ আলী, হঠাৎ রাইফেলের গুলির

বাংলাদেশ কথা কয়

শব্দ। অতর্কিতে তার কুলির পানি পড়ে লুগীথানা ভিজে গেল। শালুরঘাট ত্রিজের দিক থেকে এসেছে শব্দটা। কিন্তু এখন এই অসময়ে হঠাৎ গুলির শব্দ কেন? দেড় মাস আগেও অবশ্য শালুরঘাট থেকে মেশিনগান আর রাইফেলের আওয়াজ আসত, তখন এত বেশী শব্দ শুনে আতঙ্কটা মনে মনে সয়ে গিয়েছিল। এখন সামান্য এক আধটু শব্দ হলেও অন্যরকম আজ্ঞে বাজ্ঞে কথা মনে হয়। কেমন যেন ছিম্ ছিম্ করে বুকের ভেতরে :

শালুরঘাটের ত্রিজটা নিয়ে কি অসম্ভব যুদ্ধই না হ'ল দু'মণ্ডাহ ধরে। প্রথমে ই, পি, আর এর লোকেরা ওটা দখল করে রেখেছিল। পরে দেড়শ মিলিটারী এনে ভারী ভারী কামান আর মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ চালান ওদের ওপর। দিনরাত কেবল গোলাগুলির শব্দ : ফট্ ফট্... গুড়ুম... ফট্ ফট্।

বাঙালী ফৌজের দখলে যখন এই এলাকা ছিল তখন আবিদ আলীও জয়বাংলা পতাকা লাগিয়েছিল বাড়িতে। না, না, আবিদ আলী ঠিক লাগায় নি; তার ভাইপো তাহের লাগিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আবিদ আলীর সায় ছিল বললেও, মিলিটারি বিশ্বাস করবে না। আজকাল চার-চারটা পাকিস্তানী পতাকা উঠেছে তার বাড়ীতে। দু'মাস ধরে দাড়ি রেখেছে সে। মাথায় আগে টুপি দিত না, এখন শোয়ার সময়ই শুধু টুপি খুলে রাখে। পাকিস্তানী পতাকার ছবিও পাঞ্জাবীতে সাঁটা থাকে সর্বক্ষণ। তাছাড়া, আবিদ আলী থানা মুসলিম লীগের কনভেনর ছিল, এখনও কারো কাছেই অজানা নয়। শালুরঘাটে কিছু দিন হ'ল মিলিটারির ছাউনি পড়েছে; ওর গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূর। বাঙালী ফৌজ হটিয়ে ওখানে যে-মিলিটারি আসবে, এটা সে প্রথমেই টের পেয়েছিল। বলতে গেলে সেই এলাকার মধ্যে সে-ই প্রথম মিলিটারির কাছে গিয়ে চিনি পরিচয় করে এসেছে। ছোটো বড় মোরগ আর এক কঁদি

মর্তমান কল। নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলে মিলিটারিদের জন্তে উপঢৌকন। কথাগুলো অবশ্য পাকিস্তানী বেতারের কথা সে শুধু তোতাপাখির মত ভাঙা ভাঙা উত্থ'তে পাঞ্জাবী হাবিলদারকে বলে এসেছিল। জিনি'স পেয়ে আর কথা শুনে হাবিলদার সায়েব রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিঠে একটা মুহু আঘাত করে বলেছিল, তুম শালা হামারা দোস্ত হ্যায়।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়েও হাবিলদারের কথাটা মনে মনে আউড়েছিল আবিদ আলী। গাঁয়ের ছ্চারজনকে ডেকে বলেছিল, কথাটা। আগের মত লোক আর নেই গ্রামে। অনেকেই আরো হুর্গম গাঁয়ে চলে গেছে প্রাণের ভয়ে। ভয় হয়তো একসময়ে তারও ছিল, কিন্তু আজকাল আর মিলিটারিকে তার ভয় নেই। ভয় এখন অশু কিছু। ক'দিন থেকে শোনা যাচ্ছে এদিকেও নাকি অসংখ্য বাঙালী গেরিলা এসেছে। গাঁয়ে তো শত্রুর অভাব নেই, বলতে গেলে গাঁয়ের সবাই শেখ মুজিবের দলে। সুতরাং কখন যে কি হয় কে জানে!

পাটগাছের পাতাগুলো আবার নড়ে উঠল।

সামাদ আর নসু ঘাপ্টি মেরে মেরে এগিয়ে আসছিল দীঘির ঘাটের দিকে। দুটো রাইফেল ছিল হু'জনের কাছে। পাটক্কেতের মাঝখানে ও দুটো ভাল করে লুকিয়ে এসেছে। অবশিষ্ট দুটো গ্রেনেড আছে ওদের পকেটে। এরকম নিরস্ত হাতে আবিদ আলীর সামনে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিল নসু। সামাদের কাছে বারবার আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু সামাদ বুঝিয়ে বলেছে, আবিদ আলী যাতে ওদের নিরস্ত্র ভাবে, সেটাই চায় সে। সামাদ ভাইয়ের কথার ওপর তো আর কথা বলা যায় না। পর পর পাঁচটা অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছে সামাদ, প্রত্যেকটাতেই সফল হয়েছে। আর নসুর এই হচ্ছে প্রথম বার।

ঘাট থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল আবিদ আলী, যেন মাটি

বাংলাদেশ কথা কর

ফুঁড়ে সামনে উঠে এল সামাদ আর নসু। প্রায় ভূত দেখার মত
আবিদ আলী আতকে উঠল, কে তোমরা ?

আমরা ? হুঁপা এগিয়ে গিয়ে সামাদ বলল, আমরা মুক্তিফৌজ।

এই আশঙ্কাই মনে মনে করেছিল আবিদ আলী, কিন্তু ভাল ভাবে
তাকিয়ে দেখল, ওদের হাতে কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই। একটা ঢোক গিলে
গলার কাছে আটকে থাকা উৎকর্ষা নীচে নেমে গেল। নিজের দোঁদও
প্রতাপের কথা মনে করে সাহস সঞ্চয় করল সে। বলল, কি চাও ?
একটু আশ্রয়। আজ রাতটা আমরা এখানে থাকব।

মুক্তিফৌজের হাতে তো অস্ত্র থাকে শুনেছি, তোমাদের হাত
দেখছি একেবারে খালি।

আমরা নিরস্ত্র। পথে মিলিটারির তাড়া খেয়ে রাইফেল ফেলে
এসেছি।

এবারে নিজেকে বেশ সাহসী বলে মনে হ'ল আবিদ আলীর।
বলল, ওসব মুক্তিফৌজের জায়গা এখানে হবে না।

কেন ? সামাদ সবিস্ময়ে তাকাল তার দিকে।

আমি তোমাদের জায়গা দিই, আর মিলিটারি লোক এসে
আমাকে ধরুক আর কি !

আপনি আশ্রয় দিচ্ছেন, তা অস্ত্র কে জানতে যাচ্ছে ?

আবিদ আলী যাবার জন্তে পা বাড়াল, বাতাসেরও কান আছে,
বুঝলে ? যেতে যেতে বলল, ভারী তো মুক্তিফৌজ করছ,
মিলিটারির সাথে পারা অত সোজা নয় !

তাহলে আমরা কি করব ? বলল নসু।

আমি কি জানি। পাকিস্তানটাকে ভেঙে টুকরো করার সময় তো
আর আমাকে জিজ্ঞেস কর নি।

সেটা বড়ই অত্মায় হয়ে গেছে। হাত কচলাতে কচলাতে বলল
সামাদ, এখন সহায় সম্বলহীনভাবে কোথায় যাই বলুন।

জাহান্নামে যাও। চলতে চলতে বলল আবিদ আলী, মিলিটারির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে! যন্তো সব! ওদের জোয়ানদের শরীর দেখেছ? কতটুকু তাকদ ধরে ওরা, তা জান?

সবই জানব না হয়। আপনি আমাদের শুধু এখানে রাত কাটাবার অনুমতি দিন। আপনার বাইরের ঘরেই দু'জনে পড়ে থাকব।

ইচ্ছে হয় ঐ বৈঠকখানায় থাক গে। কিন্তু কোন বিপদ হলে আমি জানি না। এদিকে মাঝে মাঝে মিলিটারি আসে। ধরে নিয়ে গেলে আমায় জড়িয়ে না।

কথাটা বোধ করি সামাদ ও নসরর মনঃপুত হ'ল, ওরা চলে গেল বৈঠকখানার দিকে। আবিদ আলী বাড়ি ঢুকতে একবার নাক-কুঁচকে তাকাল পেছন দিকে। হ্যা! ওর নাম মুক্তিফৌজ! ছোটো পটকা ম রা ছেলে, ওরা যুদ্ধ করবে পাকিস্তানী জওয়ানদের বিরুদ্ধে! ভেবে বড্ড হাসি পেল আবিদ আলীর। ইচ্ছে করছিল চড় বসিয়ে দেয় ছোঁড়া ছোটোকে। কিন্তু এখনকার যা অবস্থা! কাউকে ধমক দিয়েও কথা বলা মুশকিল। দেশে আইন বলে তো কিছু নেই। হয়তো দল বেঁধে মারতে আসবে।

যাহোক একটা বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ল। মিলিটারির কাছে মুক্তিফৌজের আগমন-বার্তা পেঁঁছে দেওয়া দরকার। এ অঞ্চলের শান্তি কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে তার তো নিজস্ব একটা কর্তব্য আছে। যতই নিরস্ত্র হোক, এসব বেইমানের ধরিয়ে দিতে পারলে মিলিটারির কাছে কত সম্মান বেড়ে যাবে তার। আবিদ আলীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটা বেশ পাকাপোক্ত হবে। ভালই হয়েছে ছোকরা ছোটোকে থাকতে দিয়ে।

আতিয়া জায়নামাজ বিছিয়ে দিয়ে গেল। আবিদ আলীর বোল বছর বয়েসের মেয়ে আতিয়া। ফাল্গুনেই বিয়ে হয়ে যেত মেয়েটার। কিন্তু একটার পর একটা গোলমাল বেধে যাওয়ায় বিয়ের তারিখ

বাংলাদেশ কথা কয়

পিছিয়ে গেল। কবে-যে বিয়ে দিতে পারবে, দেশের অবস্থা কদিনে ফিরবে, কে জানে? আতিয়া পার হয়ে গলে আরেকবার শাদী করার ইচ্ছে আছে তার। গত বছর মারা গেছে আতিয়ার মা। তাই সংসার-টংসার দেখার জন্তে একজন নতুন লোক দরকার। মেয়ের বিয়ে হলে এ ব্যাপারে কারুর আপত্তি থাকার কথা নয়! জায়-নামাজে দাঁড়িয়ে আবিদ আলী তক্বীর বাঁধল।

সামাদ আর নসু ততক্ষণে বৈঠকখানায় পাটি বিছানো পেয়ে সটান শুয়ে পড়েছে। বড়ার থেকে তিন দিনের হাঁটা পথে এসে ওদের শরীর এখন দারুণ ক্লান্ত। অবশ্য বাড়ি এবং গ্রামের সবরকম পরিচয় নিয়েছে ওরা। ক'জন লোক আছে বাড়িতে মুক্তিফৌজের ব্যাপারে কার কি মনোভাব, সে খবর আগে থেকেই জানা।

ব্যাপারটা কিন্তু ভাল হ'ল না। নসু বলল।

কিসের ব্যাপার?

আমরা-যে মুক্তিফৌজের লোক, এটা ওকে বলা ঠিক হয় নি। লোকটা বিশেষ সুরিধের নয়।

সে জন্তেই তো বললাম। দেখা যাক ব্যাটা কি করে!

আমাদের ধরিয়ে দিতে পারে।

ধরাক। নিস্পৃহ অথচ নির্ভয় সামাদের কণ্ঠস্বর।

ও যদি মিলিটারি ডেকে আনে?

সে তো আনবেই। সামাদের স্বর আগের মতই দৃঢ়। বলল, মিলিটারি ডাকবে বলেই তো মুক্তিফৌজের পরিচয় বললাম।

শালুরঘাট থেকে কয়েকটা খান সেনা যদি আসে তো মন্দ কি?

কিন্তু যদি দশ-পনেরো জন আসে?

তাহলে আজ রাতেই বাকিগুলোকে ঘায়েল করে শালুরঘাট ব্রিজ দখল করবে আমাদের বন্ধুরা। আমরাও পালিয়ে গিয়ে শালুরঘাট আক্রমণে যোগ দেব।

আর যদি সংখ্যায় কম আসে ওরা? ছ'জন কি চারজন?

তা আসারই সম্ভাবনা বেশী। এক্ষেত্রে আমরাই আক্রমণ চালাব ওদের। আমাদের রাইফেলের খবর ওরা নিশ্চয় জানবে না। সুতরাং রাইফেল নিয়েই তৈরী থাকতে হবে।

নামাজ শেষে বৈঠকখানায় এল আবিদ আলী। বলল, ঘুমিয়ে পড়লে না কি তোমরা?

হ্যাঁ। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। বলল সামাদ।

তা তো লাগবেই। চেহারা দেখে ভাল মানুষের ছেলেই তো মনে হচ্ছে। কি হয় এসব যুদ্ধ করে?

দেশের স্বাধীনতা—

রাখ তোমার স্বাধীনতা। হিন্দুস্থানের সাথে যুক্তি করে দেশটা তো বিক্রি করতে চেয়েছিল তোমাদের মুজিব। কি সাংঘাতিক লোক বাপু! বলে কি না হিন্দু আর মুসলমান সব সমান করে দেবে। ওরা হবে আমাদের সমান। তাহলে আর পাকিস্তান চাইলাম কেন? নস্রু কি জবাব দিতে যাচ্ছিল। সামাদ থামিয়ে দিল। বলল, এসব নিয়ে তর্ক করে লাভ কি? বরং আমরা ঘুমাই।

ঘুমাও, আচ্ছা করে ঘুমাও। আমি আবার বাইরে যাচ্ছি।

বৈঠকখানা থেকে বাইরে নেমেএল আবিদ আলী। সে চলে যেতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা ছ'জন। আড়াল থেকে লক্ষ্য করল, আবিদ আলী শালুরঘাটের দিকেই যাচ্ছে। ঠিক যাচ্ছে নয়, যেন দৌড়াচ্ছে। ওরা চলার ভঙ্গীতেই উদ্দেশ্যটুকু স্পষ্ট হয়ে গেল সামাদের কাছে।

বৈঠকখানা ছেড়ে বেরিয়ে এল সামাদ আর নস্রু। শালুরঘাট থেকে তার ফিরতে নিশ্চয়ই ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। এই সময়ে বাড়িটা ভাল করে দেখে নেওয়া দরকার। তাদের আগমন-সম্পর্কে আবিদ আলী বাড়িতে কিছু বলে থাকলে তা-ও জানা যাবে।

বাংলাদেশ কথা কয়

এই যে শোন। একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে এল তাদের দিকে।

কি বলছেন? সামাদ প্রশ্ন করল।

কোথেকে আসা হয়েছে?

শালুরঘাট।

আঁা? ওদিক থেকে এসেছে? শালুরঘাটে তো মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছে। তবে যে শুনলাম মিলিটারিরা জোয়ান ছেলেদের হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিচ্ছে?

ঠিকই শুনেছেন!

ওরা না-কি ঘর থেকে মেয়ে-বউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে?

হঁ্যা।

সব আল্লার গজব। নইলে কখনও এমন হয়? পাপের ভারে আমাদের দেশটা একেবারে ডুবে গেছে হে। বৈশ্বরিক কাম-কারবারের শেষ নেই। সেজন্তে এবারে শোধ নিচ্ছে আল্লাহ!

কিন্তু মেয়েদের ওপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে—

হবে না? আজকালকার মেয়েগুলোকে দেখেছ? মাথায় ঘোমটা পর্যন্ত দেয় না। আমাদের কালে আমরা নিজের সহোদর বোনের মুখ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে পেতাম না। তা তোমরা এদিকে কি মনে করে?

আমরা এই বাড়ির—মানে, কি যেন নাম?

আবিদ আলী?

হঁ্যা, হঁ্যা। তাঁর কাছে এসেছি। সামাদ জানাল, উনি আমাদের খুব পরিচিত।

তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাড়ির ভেতরে যাও। কই রে আতিয়া! আতিয়া!

কি চাচা? বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল আতিয়া।

এরা তোদের বাড়িতে এসেছে। আবিদকে ডেকে দে।

বাজান বাড়ি নেই। আতিয়া জানাল।

তাহলে তোমরা দাওয়ায় বসে পড়। বুদ্ধ বলল, ও নিশ্চয়ই এসে পড়বে শিগ্গিরই।

আতিয়া ছোটো জলচৌকি এনে রাখল দাওয়ায়। সামাদ ও নস্র বসল। বুদ্ধ অন্তরিক্কে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু এ অবস্থায় বেশী ক্ষণ বসে থাকা মোটেই উচিত নয়। কে জানে কখন অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধুরা সব এসে উপস্থিত হবে!

এই যে, শোন। সামাদ ডাকল আতিয়াকে, একটু পানি খাওয়াতে পার? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

খিদে পেলে কেউ বুঝি পানি খায়?

বিনা পয়সায় ঐ একটা জিনিসই তো পাওয়া যায় বাংলাদেশে।

আতিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল সামাদ নস্রকে কানে কানে বলল, দেখবি কিছু খাবারও চলে আসবে পানির সাথে। কাউকে খাওয়ালে বাঙালী মেয়েরা দারুণ বর্তে যায় ভাই।

মেয়েটা ভারী ভাল। ওর বাপের মত নছার নয়। বলল নস্র।

তোর মনে ধরেছে বুঝি? হো হো করে হেসে উঠল সামাদ।

আতিয়া এল কিছু চিঁড়া আর গুড় সাজিয়ে নিয়ে। থালাটা ওদের সামনে মেলে ধরতেই ছেঁ। মেরে হাতে নিল সামাদ। গুড় আর চিঁড়া মিলে অনবদ্য খাবার, বিশেষ করে যখন কাল ছপূরের পর আর খাওয়া হয় নি। মেয়েটাকে সামনে দেখে নস্রর আবার লজ্জা লজ্জা ভাব।

যেন ব্যাটা ওর ভবিষ্যতের স্বপ্নরবাড়িতে এসেছে আর কি!

চিঁড়া-গুড় খেয়ে খিদের উপশম ঘটল কিছুটা। আতিয়ার কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে পানির গ্লাস নিল সামাদ। বলল, তোমার তো পর্দা করার কথা। এভাবে আমাদের সামনে আসার তো কথা নয়।

আমি ওসব মানি না। বলল আতিয়া, বাজান অবশ্য খুবগালি দেয়।

বাংলাদেশ কথা কয়

মা শাসন করে না ?

মা নেই। আর অন্য কেউ শাসন করলেই বা মানছে কে ?

এবারে উঠে পড়তে হয়। নসর বোধকরি আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার ইচ্ছা ছিল। সামাদ হাত ধরে টেনে তুলল ওকে।

আমরা একটু ঘুরে আসছি। আতিয়ার দিকে তাকিয়ে সামাদ বলল, তোমার বাবা এলে বলো, আমরা খানিক পরে আসব।

উঠোন পেরিয়ে বাইরে এল ওরা দু'জন। ঘরগুলো মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরের দিকটাও ভাল করে দেখে নিল। পাকিস্তানী হানাদারেরা ক'জন আসবে কে জানে ? তাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্তে ঠিকমত পজিশন নিয়ে তৈরী থাকতে হবে। সামাদ আর নসর অতি সন্তর্পণে ঢুকে গেল পাটক্ষেতের মধ্যে।

পাটগাছের পাতগুলো আবার নড়ে উঠল।

ওরা এল, সংখ্যায় পাঁচ জন। যে-রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে আসবে ভেবেছিল সামাদ, সে পথে ওরা আসে নি। ফলে পজিশন গড়বড় হয়ে গেছে। বুদ্ধিহীনতার জন্তে নিজেকে তিরস্কার করতে ছাড়ল না সামাদ। যা-ই হোক, এবার নতুনতর পজিশন নিয়ে তৈরী থাকতে হবে। অবশ্য ওরা আওতার মধ্যে না এলে সবটুকু চেষ্টাই মাটি।

বেশ সতর্কতার সাথেই বাড়ি ঢুকেছিল খান সেনারা। আবিদ আলী দূর থেকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল, ওদের কোথায় থাকার সম্ভাবনা আছে। তিন জন পজিশন নিয়ে দাঁড়াল দূরে, আর দু'জন বৈঠক-খানার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় ওরা ? ঘরে ঢুকেই খান সেনাদের দলপতি হিম্মৎ খান হেঁকে উঠল, চিড়িয়া ভাগ গিয়া। আবিদ আলী ব্যাপার বুঝে দৌড়ে এল কাছে, ও ঘরেই তো ওরা ছিল, হুজুর। তবে কি খবর পেয়ে পালিয়ে গেল ?

বাড়ির ভেতরে ঢুকে আতিয়ার কাছে সব খবর পেল আবিদ আলী।

বাইরে এসে বলল, কিছু ভাববেনা না হুজুর। ওরা গাঁয়ের দিকে গেছে। একটু পরেই চলে আসবে।

তুম শালা বুড়বক হো! চোখ পাকিয়ে হিন্মৎ খান বলল, উয়োহু নেই আয়েগা।

সত্যি বড় বেকায়দায় পড়ে গেল আবিদ আলী। হাত জোড় করে অনুন্নয়-সহকারে শতবার বোঝাতে চেষ্টা করল ওরা আবার ফিরে আসবে। এসময়টা চুপচাপ কোথাও তাদের বসে থাকা দরকার। তাছাড়া, ওরা সবাই যখন মেহেরবানি করে বাড়িতে তশরিক এনেছেন, তখন গরীবালয়ে কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে বৈ কি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে রান্নাবান্না হয়ে যাবে। বৈঠকখানায় ওদের বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে আবিদ আলী ছুটোছুটি শুরু করল। চটপট শরবৎ তৈরী করে আনল। শালুরঘাট মিলিটারি ছাউনীর খোদ হাবিলদার এসেছে তার বাড়িতে, এ কি কম ইজ্জতের কথা? ছুটো বড় গোছের মোরগ জবাই করা হ'ল তাদের জন্যে। পোলাও কোর্মা। রাঁধারও তোড়জোড় চলল।

ওদিকে মিলিটারি এসেছে জেনে সারা পাড়ার লোক, বিশেষ করে মেয়েরা গ্রাম থেকে পালাতে শুরু করেছে। ছুরু ছুরু কাঁপছে আতিয়ার বুক। আবিদ আলীর অন্তরিকে বিন্দুমাত্র আশ্রয় নেই, সে ওদের ভোয়াজ করতেই ব্যস্ত। কিন্তু একটা ঘরে চুপ করে বসে থাকার লোক নয় খান সেনারা। ওদের হুজন পাকা কলার কাঁদিসুদ্ধ তুলে আনল গাছ থেকে। সবাই মিলে লুফোলুফি করে খেল।

বৈঠকখানায় হিন্মৎ খান কাছে ডেকে বসাল আবিদ আলীকে। তার পিঠের ওপর সশব্দে একটা চাপড় কষল। মনে মনে আদরে গলে গেল আবিদ আলী। পকেট থেকে ক্যাপস্ট্যানের প্যাকেট বের করে সিগারেট এগিয়ে দিল হাবিলদারের দিকে। সিগারেটে

বাংলাদেশ কথা কয়

একটা রামটান দিয়ে আবিদ আলীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে
আনল হিম্মৎ খান বলল, লাড়কী হায় ?

আঁ্যা ? প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে নি আবিদ আলী। ফ্যাল ফ্যাল
করে তাকিয়ে রইল হাবিলদারের দিকে।

কোই আওরত হায় তেরা পাস ?

নেই। ভয়ে কিংবা অস্বস্তিতে ঢোক গিলল আবিদ আলী। জড়িয়ে
জড়িয়ে বলল, আমার আওরত মারা গেছে।

তুম্ শালে বঙ্গাল হামকো ধোকা দেতা। আরেকটা চাপড় কবল
হিম্মৎ খান। এবার আর ঠিক আদরের চপেটাঘাত মনে হ'ল
না আবিদ আলীর।

চল্। তেরা ঘর দেখ লেঙ্গে। নিজেই আবিদ আলীকে টেনে
তুলল হিম্মৎ খান। উপায়ান্তর না দেখে আবিদ আলী ওকে ঘরের
দিকে নিয়ে এল। ভেবেছিল, মিলিটারি দেখে সবাই সরে যাবে
সামনে থেকে। কিন্তু আতিয়াই পড়ল হিম্মৎ খানের একেবারে
সামনাসামনি। উৎকণ্ঠায় ভয়ে মাথার কাপড় তুলে দিতে ভুলে
গেল আতিয়া। শিকারী কুকুরের মত লকলকে লালসার জিভ
বের করে হিম্মৎ খান জিজ্ঞেস করল, ইয়ে কোঁন হায়।
আমার মেয়ে, আমার লাড়কী।

বহুত খুপসুরত লাড়কী হায় তেরা। হিম্মৎ খান এগিয়ে গিয়ে
আতিয়ার কাঁধে হাত রাখল। ভয়ে শিউরে উঠল আতিয়া।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় আবিদ আলী নিমেষে চোখ বন্ধ করে ফেলল
ব্যাপারটা যাতে দেখতে না হয়।

থরথর করে কাঁপছিল আতিয়া। হিম্মৎ খান জড়িয়ে না ধরলে
হয়তো মাটিতেই পড়ে যেত। খাবলে ধরার মত করে হিম্মতের
বলিষ্ঠ হাতের পেশী আতিয়াকে টেনে আনল বিছানার পাশে।
তারপর বিছানার উপর আছড়ে ফেলল আতিয়ার মুমূর্ষু দেহ।

না—আ-আ-আ। চারপাশের পাশব পরিবেশকে টুকরো টুকরো করল আতিয়ার ঘৃণা ভয় ও যন্ত্রণায় আতঁনাদ।

তবু কিছু করতে পারল না আবিদ আলী, কিছু বলতে পারল না। তার অবশ দেহ সমস্ত বোধের উত্তাপ হারিয়ে ফেলছে।

আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছাড়। দেহের শেষ শক্তির বিনিময়ে প্রবল প্রতিধ্বরে চীৎকার করে উঠল আতিয়া। ছ'জন সিপাই ছুটে এল আবিদ আলীর কাছে। একজন তার ঘাড় চেপে ধরে ন টেবেলল, এ-ধার আও।

অকস্মাৎ রাইফেলের গুলির শব্দ। বৈঠকখানার দিকে আতঁনাদ করে লুটিয়ে পড়ল কেউ। সিপাই ছ'জন আবিদ আলীকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। অভ্যস্ত কায়দায় হামাগুড়ি দিয়ে রাইফেল তাক করে এগিয়ে গেল সামনে। কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। ছ'জনের ঠিক মাঝখানে পড়ল গ্রেনেডটা। ওদের কোনরকম শব্দ করার সুযোগ না দিয়েই ছিল ভিন্ন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চারপাশে। বাইরের ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু হচ্ছে বুঝতে পেরে দরজা দিয়ে ছুটে বেবিয়ে যাচ্ছিল হিম্মৎ খান। আর এক রাউণ্ড গুলি এসে তাকেও লুটিয়ে দিল মাটিতে।

স্বপ্নের মত সবকিছু ঘটে গেল আবিদ আলীর সামনে। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্মে প্রতীক্ষা করতে থাকল সেও। কিন্তু না, আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। নিথর, নিস্তব্ধ চারদিক। একসময়ে স্থলিত বসনা আতিয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবিদ আলীর বুকে। কল্পিত কণ্ঠে ডাকল : বাজান !

তবু কোন কথা বলতে পারল না আবিদ আলী। তার দেহের সমস্ত শক্তি কেউ হরণ করে নিয়েছে।

একটু পরে সামাদ আর নস্রু এগিয়ে এল ওদের সামনে। মোট পাঁচজনকেই ঠিক ঠিক ঘায়েল করা হয়েছে। মৃতদেহগুলো পরীক্ষা

বাংলাদেশ কথা কয়

করে দেখল ওরা। রাইফেল অগ্নি অস্ত্রগুলো একত্রিত করতে
লাগল নস্তু। ওগুলোই সবচেয়ে দরকারী এখন।

আমাদের ধরিয়ে দিলে আপনার কি লাভ হ'ত বলুন তো? সামাদ
প্রশ্ন করল আবিদ আলীকে।

আবিদ আলী হাটু মুড়ে বসে পড়ল তার সামনে। বলল, আমাকে
খুন কর।

হাতের রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে সামাদ বলল, আপনাকে ওরাই
খুন করবে। এই পাঁচ জনের জন্তে বাকিরা এসে খুঁজবে আপনাকে।

আমাদের গুলি নষ্ট করে লাভ কি?

সামাদ আর নস্তু এগিয়ে গেল দীঘির ঘাটের দিকে। তারপর পাট-
ক্ষেতের ভেতরে নেমে গেল।

পাটগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল আবার।

শব্দ তাড়িত

অনু ইসলাম

ছোট শহরের একটা বাসায় আমি ও সাজাহান থাকতাম। ঢাকায় একটা দৈনিকে এর আগে চাকরী করেছি এবং এর পরে হুজুর্নাই একসঙ্গে বেতার কেন্দ্রে জয়েন করলাম। এমন কি একই কামরায় আমাদের আসন পাতা হ'ল। ফলে সবদিক থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা এতই বেড়ে গেল যে, অফিসের খুব কাছাকাছি একসঙ্গে বাসা নিলাম।

ছোট বাসা হলেও হুজুর্নাইর জন্তে তিনটা কামরা এখন বিলাসিতা বলেই মনে হয়। তিন কামরার একটা ছিমছাম বাসা। ভেতরের দিকে রয়েছে সবুজ ঘাসের বিস্তৃত চত্বর। দু'পাশে রয়েছে ইট বিছানো সরু রাস্তা। আর এই রাস্তার ইটের ফাঁকে ফাঁকে অনাদরে বেড়ে উঠেছে ঘাস। এই রাস্তাই এক দিন আমার জীবনকে করে তুলেছিল বিপন্ন! ঘটনাটি ঘটেছিল মার্চে। তখন সারা বাংলাদেশে আন্দোলনের দুর্বার জোয়ার। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার প্রমত্ত ঢেউ যেন শহর-বন্দরে আছড়ে পড়েছে। চব্বিশ দিনের অসহযোগ আন্দোলন যেন চব্বিশ বছরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালীদের জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

সেই সব আন্দোলনের দিনগুলোতে আমাদের কাজের সময়সীমা দ্বিগুণ হ'ল। নির্ধারিত কাজ ছাড়াও আমাদের সহকর্মী পাঁচ জনকে সকাল পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত পালাক্রমে টালমিশনে

বাংলাদেশ কথা কয়

ডিউটি দিতে হ'ত। টাঙ্গমিশনের যখন চার্জ পড়ত তখন সম্পূর্ণ বেতার কেন্দ্রের গুরুদায়িত্ব পড়ত কাঁধে। আর এর জন্য রাত হলে কাফু' হওয়ার সাথে সাথে সুবেদার থেকে শুরু করে মেজর পর্যন্ত ক্রিপ্ট কুকুণের মত এসে অফিসার-ইন-চার্জের ওপর হস্তার ছেড়ে বলত, 'পাঞ্জাবী নাঘমা ক্যিউ বাজায়া নেহী'। তাদেরকে যা বোঝাতাম তার অর্থ এই নয় যে, সব পাঞ্জাবী রেকর্ডগুলো আর কোনদিন বাংলাদেশের বেতার কেন্দ্র থেকে অহরহ বাজবে না। কাফু'র সময় মিলিটারিই গাড়ি করে পৌঁছে দিত। এমন একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরেছি। ধরতে গেলে বারো ঘণ্টা ডিউটি দেয়ার শরীর ও মন দুইই অত্যন্ত ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি কোনরকমে খেয়ে দেয়ে ইলেকট্রিক বাতি নিবিয়ে ঘরের এক কণায় মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছি। কাফু'-এসে সারা শহর। রাত হলে প্রত্যেক ঘরবাড়ি এমনিতে ভুতুড়ে হয়ে পড়ে। যেন শহরে ব্লাকআউট হয়েছে। কোন বাড়িতে সাড়াশব্দ নেই। মাঝে মাঝে কুকুরের আর্তনাদ আর সেনাবাহিনীর ভারী ভারী গাড়ির দ্রুত চলার শব্দ ভেসে আসে। তখনই ঘটনাটি ঘটে গেল। রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। চার দিক নিস্তব্ধ-নিরুপ। ঘরের দরজা-জানালা ভাল করে আট। আছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে কথোপকথনের মত ফিসফিস শব্দ ভেবে এল আমার শিয়রের জানলার কাছ থেকে। ভয়ে তাড়াতাড়ি মোমবাতিটি নিবিয়ে দিতেই যেন বাইরের শব্দটা সচকিত হ'ল এবং তখনই বুট জুতোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। শব্দটা হয়তো ভাবল, আমি তার উপস্থিতিটা টের পেয়েছি, আর তাই বৃষ্টি আশ্রয়গোপন করতে চেষ্টা করেছে। সাজাহান আমার বিছানায় পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। অন্ধকার আমাদের চারপাশকে ভয়াবহভাবে জাপটে ধরেছে। আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পেলাম না। তবু বুঝলাম,

অসন্ন বিশদের মুখে আমাদের মুখ নীল হয়ে গেছে। বিছানা থেকে উঠবার শক্তিটুকুও যেন মুহূর্তের মাঝে লয় হয়ে গেছে। পালাবার কোন পথ নেই। মিলিটারি হলে নির্ধাত এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে এবং তারপর—ভাবতে পারলাম না। ভেসে উঠল কয়েকদিন আগে কয়েকজন নিরপরাধ নিরস্ত্র পথচারীর মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য। ভাবতে ভাবতে আবার সেই শব্দ শুনতে পেলাম। হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার শুনলাম ছ'-তিন জোড়া বুটজুতোর শব্দ। যেখানটায় গুয়ে গুয়ে রেডিও শুনছিলাম সেদিকটায় যেন ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ করে ঘরের দেওয়াল বেঁধে এগিয়ে আসছে। আতঙ্কে সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। কাঁপছি। ঘামে ভিজি যাচ্ছি, তবু নড়তে পারছি না। বুক-মুক শুকিয়ে আসছে। থাকতে পারলাম না। শুক গলায় দম আটকে গিয়ে হঠাৎ কেশে ফেললাম। আর যায় কোথা? শব্দটা দৌড়ে পিছিয়ে গিয়ে নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর খালি পায়ে পেছনের কামরায় গিয়ে দরজার ছক খুব সন্তর্পণে খুলে রাখলাম—যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য। এর পর জানি না কোথা থেকে শক্তি পেলাম। মস্তচালিতের স্থায় শোবার ঘরে আবার ফিরে এলাম। তারপর—হ্যাঁ, তারপর ধীরে ধীরে জানলার একটা পাল্লা ফাঁক করলাম! ভরা পূর্ণিমার উদ্ভিন্না জ্যোৎস্না দমকা হাওয়ার মত লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। নিটোল পূর্ণিমার বাধ-ভাঙা ঢলে আমার সেই গুপ্তচরটাকে দেখলাম—স্বচ্ছন্দে ইটের রাস্তার ওপর হেঁটে হেঁটে লেজ ছলিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

মার্চের সেই জ্যোৎস্নান্নাত রাতের শব্দ আজ আর কুহেলিকাময় মনে হয় না। নির্বিচার গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমার ছ'চোখের পাতকে সঁটে দিয়েছে। কানে শুধু বাজে মেশিন-

বাংলাদেশ কথা কয়

গানের একটানা শব্দ। সেই গরুর গায়ে যেন আজ সামরিক ইউনি-
ফর্ম। বুটের শব্দ আরো প্রখর ও স্পষ্ট হয়েছে। সেই ফিসফিস
শব্দ এখন আকাশ থেকে ভয়ঙ্কর গর্জন করে ছুটে আসে। তবু এর
মাঝে আমার আতঙ্ক আজ পলাতক।

কমলা রঙের স্রোদ

—আসাদ চৌধুরী

॥ ১ ॥

বেকার না হয়েও বেকার। হাতের টাকা পয়সা যা-ছিল ফুরিয়ে গেছে। ঘড়িটাও বিক্রি করে ফেলেছি। বন্ধুর বাসায় আছি—তিনি ছেলেমেয়ে সহ গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। বিরাট বাসায় সারাদিন ভূতের মতো শুয়ে-বসে থাকি। সস্তা ডিটেকটিভ বই পড়ার জন্যে বন্ধুকে গালাগালি করতাম—এখন সে-সব বই পড়ছি। সেদিন হঠাৎ করে সহজ নামাজ শিক্ষা কিনে এনেছিলাম। মাঝে মাঝে একা একা ছেলেমানুষি করি। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। তিনদিন চেষ্টা করেও পাঁচটি কলেমা মুখস্থ করতে পারি নি। একেকটা কলেমা মুখস্থ করি অর্থাৎ করার চেষ্টা করি আর শৈশবে চলে যাই—আহমদ মৌলভী সাহেবের কথা মনে পড়ে—সাপের ফণার মত লকলকে বেত্রদণ্ডের কথা মনে পড়ে—সঙ্গীসাথীদের চেহারা ভেসে ওঠে।

নিজের চেহারা পান্টাতে হয়েছে। আমার পেশাটি নাকি আমার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অতএব, একজোড়া অনিচ্ছুক গাঁফ বানাতে হ'ল, পূর্বপরিচিত 'ইমেজ স্টুডিও'র ড্রেনপাইপ ছোকরা চাল মেয়ে হাসল, বলল, 'জব্বর চেহারাটা বানাইছেন।' চশমা আগেই নেওয়া উচিত ছিল, এইবার রীতিমত চোখের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে চশমা নিলাম। ভূয়ো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর পরিচয়পত্র

বাংলাদেশ কথা কয়

যোগাড় করেছি—বেশী কষ্ট করতে হয়নি। সিগারেট ছুঁপা প্যাস—দাম তিন গুণ বেড়ে গেছে—অতএব বক সিগারেট ধরতে হয়েছে—তাও হিসেব করে খাই। কয়েকটি কাগজে আমার শখের সাহিত্যচর্চার কিছু বিল পাওনা ছিল, দুদিন অযথা রিকশা ভাড়া দিয়ে সে টাকার মায়া ত্যাগ করেছি। হাটতে ভয় লাগে, রিকশায় বা স্কুটারে চলাফেরা করি। রীতিমত হিসেব করেই চলতে হচ্ছে।

শহরের লোকজন কমে গেছে। প্রথম দিকের সেই জনস্রোতের স্মৃতি আমি বোধ হয় কোন দিনই ভুলতে পারব না—প্রাণের মায়ায় মানুষ সম্পদ ঐশ্বর্য কত অনায়াসে যে ত্যাগ করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হ'ত। বাংলা বাজারের, গেণ্ডারিয়ার চার জন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিহত হয়েছেন—কয়েকজনের কোন খোঁজই পাচ্ছি নে—ক্রুদ্ধ হতে না পেরে, প্রচণ্ড ঘণায় ফেটে পড়তে না পেরে এবং তাদের স্মৃতি কিছুতেই মুছে ফেলতে না পেরে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। নিজের কাছেই কেমন যেন অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিলাম। বন্ধুবান্ধবেরা কেউ-ই নেই। আত্মীয়-স্বজন যারা আছেন, তাঁরা আমাকে আগে দেখলে খুশি হতেন—অনুযোগ করতেন রাস্তা ভুল করেছি কি না—এখন বিরক্ত না হলেও বিব্রত হন। নিকট আত্মীয়েরা শহর ছেড়েছেন বেশ কিছু দিন আগেই। রেস্টুরেন্টে জটলা নেই। বাজারে ভীড় নেই। বিকেলের পরই রাস্তাঘাট জনশূন্য হতে থাকে। প্রাইভেট গাড়ি খুবই কম। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভয় সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে। পানির ট্যাপ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরলে আমি ভারী বুটের আওয়াজ পাই। দেয়াল-ঘড়িটার শব্দ রাতে আমার তন্দ্রা ভেঙে যায়—মনে হয় অনেকগুলো বুটের শব্দ আমার ঘরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কুকুরের আওয়াজ না পেয়ে আশ্বস্ত হই। বুকের অস্বাভাবিক কাঁপ ধীরে ধীরে থামে। আমার কি অসুখ হয়েছে?

সিনেমা হাউসগুলো খুলতে বাধ্য হয়েছে। ছপুরের দিকে হঠাৎ টিকিট কেটে 'নাঙ্গে' ঢুকে পড়লাম। ছবির নাম 'সুগারকোর্স্ট', ফাইটিং ছবি। ঐ দেড়টা কি দুটো ঘণ্টা আমি স্তব্ধ ছিলাম। মাঝে মাঝে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে অবাঙালি দর্শকদের দিকে তাকাতে হয়েছে। শহরের গুজবকে তো আর অস্বীকার করতে পারি নে। সম্রাটের মত নীচে নামছি। ক্লাস-বাল্ব আলো উঠল—চমকে উঠলাম। প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল, তবু সকলের মতো আমিও আনন্দিত বদন করে নীচে নামলাম। খবরের কাগজের ক্যামেরা-মানকে আমি চিনেছি। টিভির এই ক্যামেরাম্যানটাকে নতুন মনে হ'ল। পঁচিশ পয়সা দিয়ে একশলা ক্যাপস্ট্যান ধরিয়ে মেজাজটাকে ভাল করতে চেষ্টা করছি, যেই 'বেবী'র সামনে উঠেছি, ওমনি "স্যার স্যার" শব্দ আমাকে আবার বিচলিত করে। আবার আমি সময়ের হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। আতঙ্কে, টের পাচ্ছি, ঠোঁটে চাপা সিগারেটটা কাঁপছে। তাকিয়ে দেখি শাকিল, শাকিল আহমেদ। আমার প্রথম গুরুগিরির ব্যর্থ দৃষ্টান্তের জলজ্যান্ত দলিল। দূর থেইকা দেইখাই চিনছি। কই থাহেন এহন ?

প্রাণপণে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে সত্যকথা বলাই সঙ্গত মনে করি, 'কাওয়ারান বাজার'।

বাপরে। ভয় পেয়েছে এমনি একটি ভঙ্গি করে সে। জানতে চায়, 'কত নম্বর'। নম্বর বললাম। সঠিক নম্বরই বললাম।

আচ্ছা, যামু স্যার এক সময়।

হঠাৎ ওকে আঘাত দিতে কেন-যে ইচ্ছা হ'ল জানি নে—অভিনয় করলাম, তা তোমার নামটা যেন...

ভুইলা গেছেন ? বিস্মিত হলেও মোটেই আহত হয় না সে, বলে, শাকিল আহমেদ।

বাংলাদেশ কথা কয়

আমরা হাঁটছিলাম। শাকিল মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ চোখে চারদিক দেখে নিচ্ছিল। আমার একটা পাজামার দড়ি দরকার—কুটপাত থেকে কিনলামও একটি। হঠাৎ শাকিল বলল, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা ছিল, স্যার, যাব এক সময়।

নিশ্চয়ই যাবে। তবে, বোধ হয় তুমিই যাবে না। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, মিলিটারির বড় বেশি আনাগোনা হে।

যামু স্যার বলেই শাকিল একটা স্কুটারে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কর্দমাক্ত একটি অচেনা রাস্তা ধরে চপ্পল পায় দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছি, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। একটা সবুজ মোটরগাড়ি শিষ দিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। সুরটা অনেকটা যেন আমার সোনার বাংলার মতো। যে-ভাবে বাস থামায় সেভাবে পরবর্তী সবুজ ট্রাকটাকে থামালাম। গটগট করে নেমে এল কয়েকটি সৈনিক—সঙ্গে শাকিল। সে বলছে—ঐ যে ছাখতাছেন নাগরের মত হাঁট-তাছে উই ব্যাডা একজন প্রফেসর—নেহি সমঝা? ওস্তাদ হ্যায়, বলেজমে পড়াতা হ্যায়।

লোকগুলো আমোদ পেয়ে হেসে উঠে। একজন পকেট থেকে মাউথ অর্গান বের করে বাজাতে শুরু করে—সুরটা বেশ পুরানো—আয় মেরে দিল কাহি ওর চল। আমি শাকিলকে বলি, এটা আনের গান না?

শাকিল বলে, কহু। ওটা দাগের গান।

বলেই সে আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শুরু করে। এতে আমি ভীষণ অপমান বোধ করি। চুপ করে থাকলেও সুরে সুরে পা নাচাই।

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখি সবকটাই ছোকরা বয়সী। কিন্তু বেশ সুন্দর চেহারা। বন্দুকগুলোও (আমার কাছে সব আগ্নেয়াস্ত্রই বন্দুক। আমার বন্ধু সেলিম অবশ্য বলতে পারে কোন্টার কী নাম। সেকেন্ডে

কয়টা করে গুলি বেরোয়। কোন্ জায়গায় তৈরী। সেলিমের কথা মনে পড়তেই মনে পড়ল ওর ঘরে ভ্যানগগের আঁকা একটা ছবি আছে) স্তন্দর, ঝকমক করছে। রাত কি দিন ঠাণ্ডর করতে না পারলেও, দেখলাম ওরা আমার মাথা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। যে-লোকটা ম'উখ অর্গান বাজাচ্ছে—হঠাৎ সে সমে না এদেই বে-আদবের মত বলল, ফায়ার। সূর্যের তীরের মত একবাঁক বুলেট এল—আর আমি মরে গেলাম। ওভাবে মরাটা আমার ঠিক পছন্দ হ'ল না, বলাই বাহুল্য এদের হাতেই যে মরতে হবে, এটা জানাই ছিল, কিন্তু 'জয় বাংলা' বলে গগন বিদীর্ণ করতে পারলাম না তো। তারপরের ছুঃখ, আমার সাংবাদিক বন্ধু আমার মৃতদেহ দেখেও রিপোর্ট লিখবে, শহরের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—এমন কি, আমার সিনেমায় তোলা ছবিরও স্তন্দর একটা ক্যাপশন বের করবে। সবুজ মোটরটা যখন উড়াল দিল, আমি যখন মৃত এবং বিষণ্ণ—তখন কলিংবেল বেজে উঠল। নিজেকে জীবিত দেখে আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ না পেয়ে লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে ছয়ার খুলে দিলাম।

॥ ৩ ॥

ঘুমাইছিলেন? ডিসটার্ব করলাম স্যার।
শাকিলের কণ্ঠের সহানুভূতিতে আমি অভিভূত হয়ে যাই।
আরে না, না, এসো, এসো, ভেতরে এসো। অবশ্য ভাবি নি যে, তুমি আসবে।
শেভ করতে করতে, আয়নায় নিজেকে দেখে, চমকে উঠলাম। স্বপ্নে আমার গৌফ ছিল না।
হয়তো অবচেতন মনে প্রতিশোধ কামনা কাজ করেছিল—অসহায় ব্যক্তি দুর্বল লোকের উপরেই গায়ের ঝাল মেটায়। আমি শাকিলকে

বাংলাদেশ কথা কয়

বসিয়ে রেখে দাড়ি কাটলাম, দাঁত মাজলাম, গোসল করলাম,
পায়খানায় সময় নষ্ট করলাম, তারপর কেটলিতে চায়ের পানি
বসিয়ে ওর সঙ্গে একটিও কথা না বলে প্রেসনোট ওরেক খবরের
কাগজ পড়তে শুরু করে দিলাম। ছবিটা ছাপা হয়েছে। সামনের সেই
টফী-থেকে বুড়োটোর জন্য আমার চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেছে।
চুলগুলো দেখে আমি আমাকে চিনতে পারলাম এবং খুশি হলাম।
স্যার।

আমি ভীষণ চমকে শাকিলের দিকে তাকাই। (তোমারে মাথায়
ব্যাণ্ডেজ কেন শাকিল? কালকে তো তোমার ব্যাণ্ডেজ ছিল না।)
বুকের মধ্যে অসংখ্য মোটর গর্জে উঠল সমস্ত দেয়াল কয়েকবার
কঁপে উঠল।

মনে পড়ল অনেক কথা। দেশের টেশের নয়—শাকিলের ছোটবেলার
কথা। ম্যাট্রিক সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করে সেই প্রথম টাকায়
আমার কথা—সেই সদরঘাট, সাতান্ন সাল, জগন্নাথ কলেজ, সেই
শাকিল। মায়ের এক ছেলে, জেদী, গাঁয়ার, একগুয়ে বিরক্তিকর
কিন্তু ভীষণ শার্প।

সোনা কিনবেন স্যার। পঞ্চাশ টাকা ভরি।
না।

কতকণ চুপ থেকে আবার বলে, সিটিজেন ঘড়ি কিনবেন, ত্রিশ
টাকায়, একদম নয়া ঘড়ি।

আত্মমর্ঘাদায় ভীষণ লাগছিল। আমাকে লুঠের মালের ক্রেতা
ভাবতে পারল শাকিল?

কর্কশ স্বরেই বললাম, বরং হাজি সাহেবের কাছে যাও, শাকিল।
বিজনেস হবে। তাছাড়া নিজের ঘড়িই বিক্রি করে দিয়েছি। টাকা
থাকলেও লুঠের মাল কেনার প্রবৃত্তি আমার হবে না।

জানতাম স্যার। অকপটে স্বীকার করে শাকিল। 'কিন্তু আগের

লাহান বোকাই রইয়া গেলেন স্যার।' ইচ্ছে হ'ল, সেই আগের মত কবে একটা চড় দেই।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, ট্যাকা নেই কাইলকা কইসেই পারতেন। আমারে কইলে ইজ্জত যাইতো গা ?

আমি চুপ করে থাকি। শাকিল পকেট থেকে খুব দামী একটা মানি-ব্যাগ বের করে। পেটমোটা মানি ব্যাগটা থেকে টাকাগুলো বের করে টেবিলে রাখে। তারপর গুণতে থাকে। মানি ব্যাগটাকে ভীষণ রোগা রোগা লাগছে। মনে হ'ল, অন্তত পাঁচ শ টাকার নোটই চল্লিশটার বেশি হবে। আমি আবাক হয়ে দেখছি, হঠাৎ শাকিল বলে ওঠে, কেটলিটা তো পুইড়া গেল, স্যার।

ও, হ্যাঁ, আমি উঠতে যাই।

ব'ন। আমি যাইতাছি।

মিনিট পাঁচেক পর সে নাস্তা আর ছাঁকপ চা নিয়ে ফিরে আসে। পাঁচ মিনিটে মাথামুণ্ডু অনেক কিছুই ভেবেছি। চা খেতে খেতে এক সময় শাকিল বলে, আমি আইজ এখানেই থাকুম স্যার।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, আমাকে শত ভিনেক টাকা ধার দিতে পার শাকিল ?

শাকিল মুহূর্তে সবটা বুঝে নিল—ফস'ল মুখটা লাল হয়ে ওঠে—তারপর শান্ত ভাবে বলে, নিয়েন স্যার।

আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। নিজের উপরই চটে গেলাম। খবরের কাগজটা নষ্ট কইরা লাভ কি ?

শাকিল বোধ হয় একবার বলেছিল।

দলামুখা খবরের কাগজটি আমার দুর্বলতা ঘোষণা করতে লাগল। টেবিলের উপর এক হাজারটাকা। এক শ' টাকার ভাঙতি পর্যন্ত সে রেখে গেছে। সিটিজেন ঘড়ি নয়, একটা ওমেগা সী মাস্টারও তার পাশে আমার আদরের অপেক্ষায় নিরীহ ভাবে অপেক্ষা করছিল।

টাকাটা পেয়ে প্রথমেই আমার কামালের কথাই মনে পড়ল। খুব অন্তরঙ্গতা না থাকলেও তুই তোকাকরি করি। ওর স্ত্রীও তুমি তুমি করে। স্কুটার ভাড়া করে ছুটলাম কামালের বাসায়—গোপীবাগে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ই ওদের তিন বছরের ছেলের খ্যান খ্যান আওয়াজ কানে এল। আমাকে বেশ তৃপ্তি দিচ্ছিল উঠে দেখি—বারান্দায় ঝাংটা হয়ে হাত পা ছুঁড়ছে ছোকরা, পাশে কাৎ হয়ে আছে একবাটি ছোট ছোট দাঁতের মত মুড়িগুলো, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রুবি আমাকে দেখে একটু শ্রান হাসল। কামাল ক্যাকানে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। রুবি চাবানাচ্ছিল, ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, অগত্যা কামালই ভেতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আসে। আমি না বসে কর্মরত রুবিকে গুনিয়ে গুনিয়ে বলি, জরুরী আলাপের মত, আমার কাছে কিছু সোনা আছে, বুঝলি, যদি চাস খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। বেচারী হ্যাঁ না কিছুই বলে না। আমার দিকে চায়ের বাটি এগিয়ে দেয় রুবি—বলে, বস, দাঁড়িয়ে কেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, একটু চিনি লাগবে।

রুবি চামচ নাড়তে নাড়তে বলে, কত করে ভরি?

কেন জানি নে, আমি মার্জিন রেখে বলি, ষাট টাকা।

অ।

রুবি হতাশ হয়েছে। রুবির অন্তত বিশ ভরি সোনার গয়না আছে—অসময়ের ভরসা। সে চলে যায় ভেতরে টুংটাং শব্দ হচ্ছে। আমি বিচলিত হই। কতক্ষণ পর রুবি একটা বিস্কুট নিয়ে এসে ছোড়াটাকে, ওদের বাবুল মণিকে দেয়। ম্যাজিকের কাজ করে বিস্কুট। বাবলুর খ্যান খ্যান বন্ধ হয়ে যায়। এতক্ষণ কামাল আর আমার মধ্যে আলাপ হচ্ছিল—আশ্চর্য, কী বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল তা পর্যন্ত ভুলে গেছি।

এক সময় কামালকে বলি, যেন ধার চাওয়ার মতলব (এটা আমি স্কুটারেও প্র্যাকটিস করেছি) তোর হাতে টাকা পয়সা কিছু আছে তো?

পাগল নাকি তুই? মাঠের আটাশ তারিখে পেমেণ্ট করার কথা আজকে এপ্রিলের বার। এখনো জয়েন করি নি। টাকার জন্তে বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলাম না। (জানি রে কামাল সব জানি।) কামালের কথার ভঙ্গিতেও দৃঢ়তা স্পষ্ট, একটা আধলাও ধার পাওয়া যাবে না। রুবিও অকরণ ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্পঞ্জের স্যাণ্ডেলটাকে নিয়ে বাবলুটা খেলছে।

আহ, সে তো জানি। আমার কাছে কিছু টাকা আছে। তোর কত টাকা হলে আপাততঃ বলবে।

রুবি চমকে ওঠে। কামাল ভেবে বলে, থাকলে গোটা ত্রিশেক টাকা দে।

আলাদা করে রাখা পঞ্চাশ টাকার নোটটা ওর হাতে দেই। দু-একজন বন্ধুবান্ধবের খোঁজ খবর আদান প্রদান করি। রুবিও অংশ নেয়, ওর সাবসিডিয়ারি ইংরেজী ছিল, বলল, জ্যোতির্ময় সারের জন্ত বড় খরাপ লাগে।

কামাল এক সময় বলে ওঠে, ভালই করেছিল রে, বিয়েটিয়ে করিস্নি। রুবি আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

রুবি বলে, গৌফের জন্ত তোমাকে ছোকরা ছোকরা লাগছে কিন্তু। আমার মনে হ'ল এক যুগ পরে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনলাম। স্বাভাবিক কথা শুনলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আগেই কামাল বলে উঠল ফিস্ ফিস্ করে, হ্যাঁরে, শেখ সাহেবের কোন খবর জানিস্? সত্যি সত্যি নাকি তিনি ধরা পড়েছেন?

হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। লক্ষ লক্ষ লোকের বিশাল জনসভা, তাঁর ডান দিকে সূর্য, সেলিমের বাসায় ভ্যান গগের আঁকা সূর্য—

বাংলাদেশ কথা কয়

আমি টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকি, দেয়ালটা সরে যাচ্ছে কেন ? চোখের সামনে কাঁপছে রেস কোর্স, ভাঙা কাচের গেলাসের মত শাঁখারি পট্টা, ইকবাল হল, ফুলবাড়িয়ায় লালেশের স্তূপ, কাগজের মত কুঁকড়ে যাওয়া রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক। টেলিভিশনের পর্দাটা কাঁপছিল, শেখ সাহেবের ছবিটা কাঁপছিল, এটিনা ঠিক মত ফিট হয় নি।

॥ ৫ ॥

‘মুক্তিকৌজে যামু স্যার।’

‘তোমার বিজনেস ?’

‘বিজনেস দিয়া কি করমু ?’

জবাব দিলাম না। ভাবছিলাম, ছয়টি বছর সে আমার সামনেই বড় হয়েছে। এম. এ. পাস করে আমি মফস্বলের এক কলেজে চাকরি পাই। ছয় বছর পর প্রথম সেই বাড়ি, মালিকরটোলা লেনের বাড়িটা, ছাড়লাম। খালান্না, শাকিলের মা, প্রথম প্রথম চিঠি লিখতেন, শেষের দিকে আর লিখতেন না, বোধকরি, ক্রমাগত খারাপ খবর দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর চিঠিতেই জেনেছিলাম শাকিল গ্যাংদের সঙ্গে মেশে—মদ মাগী ইত্যাদি...।

বোবা অইয়া গেলেন দেহি, যামু নাহি ?

পরামর্শ চাচ্ছ—অথচ ভাবতে দেবে না। আগে এক কাপ চা বানাও।

আপনি বইয়া বইয়া ভাবেন।

চা খেতে খেতে শাকিল উশখুশ করে, বলেই ফেলে, ‘স্যার, সিগারেট খাই ?’

‘বেশ তো খাও।’

এক সময় বলি, মমতাকে বলেছ ? ওর চোয়ালটা শক্ত হয়ে যায়।
‘হ্যারে জিগামু ক্যা ?’ বুঝতে চেষ্টা করি, রাগ না অভিমান। ওর
মা-ই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, মোমতাজের জন্য
শাকিল ফ্রেজি।

বল কি ? আমি শব্দ করেই হেসে ফেলি। ও যদি রাজী হয়,
তুমি একুনি পাগড়ী বাছতে ছুটবে।

হ। ছুটতাম। দুই মাস আগে অইলেও ছুটতাম। এখন যদি
ছুটি, মুক্তিফৌজে যাওনের লাইগ্যাই ছুটম।

শাকিল যা বলল, ওদের মত ছেলেরাই তা বলতে পারে। সাধারণ
ভাল ছেলের পক্ষে প্রাক্তন গৃহশিক্ষকের কাছে এত অপকটে এ ভাবে
বলাটা শুধু কঠিনই নয়—অসম্ভব। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে,
একালের তরুণদের প্রতি একটা আন্তরিক মমতাবোধ না থাকলে
শোনার ধৈর্য আমারও থাকত না।

লক্ষ্য করেছি শব্দের অভাবে সে সঠিকভাবে নিজেকে বোঝাতে
পারছিল না। আঙুলগুলো যন্ত্রণায় টেবিলের উপর থর থর করে
কাঁপছিল। চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছিল। নিজেকে প্রকাশ
করতে না পারার কবিস্থলভ অস্থিরতায় সে ভুগছিল। ছ ফুট এবং
নিয়মিত ব্যায়ামপুষ্ঠ দেহের যুবকটি সিনেমার সস্তা হিরোর মত
কান্নাকাটি করে নি—কিন্তু আমি তার যন্ত্রণাকে বুঝেছিলাম এবং
আমার হৃৎক হচ্ছিল আমি তার কোন কাজে লাগতে পারব না
ভেবে।

যেয়েমানুষের পরিচয় সে জানে। যাদের ছবি সিনেমা পত্রিকায়
ছাপা হয় তাদের সঙ্গে একাধিকবার রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতার কথাও
সে বলেছিল। তার ধারণা ছিল, (হয়তো সিনেমা বা গল্পের বই
থেকে এ ধারণার জন্ম) প্রেম অতি পবিত্র—চিত্তহর, প্রাণহর স্বর্গীয়
অভিজ্ঞতা মৃতদেহ থেকে সোনার গয়না খুলে এনেছে সে, গ্যাংদের

বাংলাদেশ কথা কয়

সঙ্গে থেকে ইসলামপুর আর নবাবপুরেই আশি হাজারের বেশি নগদ টাকা আর মূল্যবান সামগ্রী সে সামরিক বাহিনীর হাতে গুলিখেয়ে মর'র বুঁকি নিয়েও সংগ্রহ করতে পেরেছিল। নিদ্রাহীন রাতের অভিজ্ঞতাও তার নতুন নয়। প্রথম প্রথম জুয়া খেলা শিখতে গিয়ে তো তিন চার রাত সে এমনিই কাটিয়েছে। তবুও একটানা বাহাতুর ঘটা তার জীবনের অনেক কিছু। মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে আবিষ্কার করা, জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করা—তার অর্থ, কারণ অল্প নকান করার মত দার্শনিক মনোভাব তখন তার ছিল না—এখনও খুব বেশি নেই। ত্রিশ হাজার নগদ টাকা দিয়ে সে তখন মমতাজের বাবার ডুবন্ত ব্যবসায়ের পার্টনার হ'ল, নিজেকে তার ভাবী জামাতা ভেবে মনে ভাল হবার লক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দিত হচ্ছিল, তখুনি একটি দুর্ঘটনা তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। লোভী, হিসেবি, স্বার্থপর, শাকিলের অঙ্কে ভুল ছিল না। দিনকাল খারাপ না হলে মমতাজকে ওর সঙ্গে সিনেমায় রেস্টুরেন্টেও তিনি যেতে দিতেন। তবু আলাপের সুযোগ দিয়েছিলেন মমতাজের বাবা। না দিলেই ভাল করতেন। পলাতক রমণীদের, ভীত কম্পিত গৃহস্থ রমণীদের এবং অসংখ্য মৃত যুবতীদের ব্যঙ্গ করে মমতাজ যখন তার গুণামিকে বীরের সম্মান দিচ্ছিল, আঙ্গুলগুলো কোলে তুলে নিয়ে 'সুসময়ের' জন্তুকৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল, তখনই তার রক্ত গরম হ'ল। একটা চড় মারার দারুণ ইচ্ছাকে কোন রকমে দমন করে সে চা না খেয়েই (এটাই তার স্বপ্ন ছিল—বলা চলে একমাত্র স্বপ্নবিলাস) চলে এসেছিল। সারারাত মদ খেয়েছিল এবং পরদিন বেহুঁশের মত ঘুমিয়ে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিল, সে সময় আমার সাথে তার দেখা। আমার অবজ্ঞা সে গায়ে মাখে নি। আমাকে পেয়ে সে নাকি বেঁচে গিয়েছিল। গতানুগতিক জীবনের প্রতি লোভ নেই তার। কোনকালেও ছিল না। একুশ বছরের যুবকের কাছে প্রেম তার মর্যাদা হারিয়ে

ফেলেছে। সম্মান ও প্রতিশক্তির প্রতিও আর তার লোভ নেই।
না স্যার, রাজনীতি ফাজনীতি বুঝি না। বুঝবার চাই না—যেই
হালায় ছাশের লগে হুশমনি করব—খওম কইরা হালামু।

তবুও সে মুক্তিফোজে যেতে চায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
জানিয়েছে—ড্রাইভার দরকার—তাই সে যাচ্ছে।

স্যার।

উম।

কা কন ?

সে এখন আর ছটফট করছে না, যা বলার বলা হয়েছে। এখন আর
ব্যস্ততা নেই। আমার মুহূর্তে মনে হ'ল, আমি যা-ই বলি না কেন,
ওকে সিদ্ধান্ত থেকে ফেরাতে পারব না। ওর মায়ের মুখ ভেসে
উঠল। তাঁর প্রতি শুধু শাকিলেরই নয় আমারো কর্তব্য আছে।

বললাম, খালান্নার কী হবে ?

কী আর অইব। ট্যাকা রাইখা যামু। কিপটা বুড়ি এক পয়সাও খরচ
করব না জানি। খালি মিলাদ শরীফ পড়াইব আর মৌলভী ধইরা
ধইরা খাওয়াইব।

ওর কাছে সহজ ভাবে কথাটা বলা দরকার, জানি বলার প্রয়োজন
নেই, তবুও বললাম, শাকিল, হীরো হতে চেষ্টা কর না।

শাকিল হেসে ফেলল। বলল, জানি স্যার, আপনি না কইবেন না।

তারপর আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে (আমার এ্যাশটে, সকালেই
ঝেড়েছিলাম, এখন প্রায় ভরে গেছে—শাকিল বড় বেশি সিগারেট
খায়) ধরা গলায় বলল, আমি মায়ের কুপুত্র। পড়ালেখা শিখি
নাইক। বদমাইশ হইলাম। স্যার, আপনি হারে দেইথেন।

শাকিল যখন চলে যাচ্ছিল তখন মনে পড়ল, আমার বন্ধুটি, যার
বাসায় আছি, তিনি লোক মারফৎ জানিয়েছেন ছ-একদিনের মধ্যেই

বাংলাদেশ কথা কয়

আসছেন। আমি শাকিলকে ডেকে ভনিতা না করেই বললাম,
আমাকে দুই টিন কেরোসিন তেল, সের পাঁচেক চিনি আর একটা
সর্ষে তেলের টিন যোগাড় করে দিতে পারবে তো?
দেখি।

শাকিল চলে গেল।

॥ ৬ ॥

বন্ধুপত্নী হাসতে হাসতে বলছিলেন, এত সাংসারিক বুদ্ধি আপনার
—অথচ আপনার কপালেই বউ জোটে না।

আমি খুব আয়েশ করে বহুদিন পরে লিপটন ইয়েলো লেবেলের
স্বাদ নিচ্ছিলাম। কথা না বলে খালি কাপটা এগিয়ে দিলাম।
মুখে অবশ্য ‘রসিকতা উপভোগ করছি’ মার্ক। হাসিটা বিছিয়ে
রাখলাম। তিনি চা ঢালছিলেন, এমন সময় কে যেন দরোজায়
জোরে জোরে ধাক্কা দিল—ওর হাত কেঁপে চা কিছুটা টেবিলে
পড়ে গেল। অতঃপর খুব সুন্দর হাসি উপহার দিয়ে বলতেন ‘সরি’
—তাকিয়ে দেখি বেচারার মুখটা পাকা কলার খোসার মত বিবর্ণ
হয়ে গেছে। বাইরে থেকে একবার আমার নাম ধরে ডাকাডাকি
হচ্ছে। তিনি আমার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন, ‘আমাদের কী
হবে?’ আমার কিন্তু তখন মনে পড়ছিল শাকিলের কথা, আহা,
ওর সঙ্গে কোন হৃদয়বতী রমণী অন্তত নিঃস্বার্থ ভাবে এই আন্তরিক
আচরণটুকুও যদি করত।

আমি মজ্জবলে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। আমি জানি, বন্ধুপত্নীর
কাছে আমি হীরো হয়ে যাচ্ছি—তবুও গটগট করে গিয়ে খিল খুলে
দিলাম। বাইরে বিষ্টি হচ্ছিল—দুয়ার খুলতেই ঠাণ্ডা বাতাসের
স্নিগ্ধতা অনুভব করলাম। লোকটা, না মিলিটারি নয়, রিকশাওয়ালা,
ভীষণ রেগে গেছে—লন, মালগুলি ধরেন, মিয়া কতক্ষণ ধইরা
ডাকবার লাগছি। জিনিসগুলো রেখে গামছা দিয়ে মাথাটা মুছতে
মুছতে জিজ্ঞেস করে, শাকিল সাব আইছিল?

আমিই পান্টা প্রশ্ন করি, সে কই ?
তিন চাইর দিন ধইরা তো লা-পাত্তা ।
দাঁড়াও, টাকাটা এনে দিচ্ছি ।
হলুদ দাঁতগুলো বের করে সে হেসে ওঠে ।
আরে বাপ, আমনে হ্যার ওস্তাদ । টাকা তো হ্যাই দিয়া গেছে ।

॥ ৭ ॥

ছ দিন পরেই আমার এক ছাত্র, শাকিলের মতো নয়, প্রায় প্রতি-
ষ্ঠিত সাংবাদিক, এসে বললেন, খবর পেলাম মিলিটারির লিস্টে
আপনারও নাম আছে । আপনি চলে যান, স্যার । প্লাজ ।
বললাম, তুমি ?
আমি যাব কেন স্যার, আমি তো কিছুই করি নি ।
তা অবশ্য । বোধ হয়, সে অর্থে শাকিলও কিছু করে নি ।
সীমান্ত পেরিয়ে গাইডের হাতে শেষ পক্ষাশ টাকা থেকে ছুটো দশ
টাকার নোট দিয়ে দিলাম । সারা রাত হাঁটার ফলে শরীরে যে-
অবসাদ অনিবার্য, বিস্ময় কৌতূহল এবং নিরাপত্তা বোধের ফলেই
বোধ করি তা কেটে গেছে । রেস্টুরেন্টের লোকগুলোর হাসি-
তামাশা, দোকানের সামনেই মানি রেকেক্টরদের দরদস্তুর রসি-
কতা—প্রাণ খুলে উপভোগ করছিলাম ।
গাইডটি হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে । তার মাথার উপর, আমার
মাথার উপর সূর্যের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে । আকস্মিক মনে
পড়ল, সেলিমের দেওয়ালে স্ব-নির্বাসিত ভ্যান গগের একটি নিসর্গ-
চিত্র ছিল । হলুদ কমলা লালের ছোপ ছোপ রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে
ছিল, শিহরিত সূর্যের পাশে সবুজ অরণ্য ছিল ।
সঙ্গীহীন স্বপ্নভাষী খোঁড়া গাইড অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে
বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে ।

দর্শাবাসুর বসতি

—সত্যেন সেন

একেবারেই চিনতে পারি নি। চিনতে যে পারি নি, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, চিনতে পারলেই বরঞ্চ আশ্চর্য হতাম। এক মুখ দাড়ি, উস্কো-খুস্কো চুল, চোখে কেমন এক উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। এবটা ছেঁড়া লুঙি আর ময়লা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কোন মতে তার কঙ্কাল-সার দেহটাকে ঢেকে রেখেছিল। যে-কেউ দেখলে পাগল বলেই মনে করবে। আমিও তাই মনে করেছিলাম।

কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার রাত্রি। রাত বেশী হয় নি, কিন্তু এরই মধ্যে সারা অঞ্চলটা নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেছে। একটা আসন্ন মহা-বিপদের আশঙ্কা যেন একটা গুরুভার পাথরের মত পবার মনের ওপর চেপে বসে আছে। পাক-সেনারা জেলা-শহরটাকে দখল করে নিয়ে এবার গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। খবর আসছে, নদীর দশ-পনেরো মাইল দূরের গ্রামগুলোতে ওদের তাণ্ডব চলেছে। সে-সব বর্ণনা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। নদী পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ। তাই এ পারের মানুষ ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা পালা করে রাত জাগে, ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ওই দুশমনরা যদি সত্য সত্যই এসে হানা দেয়, এই গ্রামরক্ষী বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করতে যাবে না, তারা শুধু আগে থেকে বিপদসংকেত দিয়ে গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ার করে দেবে। তার প্রয়োজনও কম নয়।

এস্টা. বই পড়ছিলাম। পড়তে বসেছিলাম বটে, কিন্তু পড়ার দিকে মন ছিল না। যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আছি, তাকেই কেন্দ্র করে চিন্তাটা পরিক্রমণ করে চলেছিল। এমন সময়ে ভেজানো দরজাটা ঠেলে সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, চমকে উঠেছিলাম। বুঝিবা একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। তন্তুভাবে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম—কে?

আমি স্যার!

‘কে? আমি কে?’ গলাটা যেন চেন-চেনা বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চিনে উঠতে পারছিলাম না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছিল, তাই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি হারুন, স্যার, আপনারই ছাত্র, সেই-যে আপনাদের এখানকার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। মনে নেই আপনার, আপনিই তো জুটিয়ে দিয়েছিলেন কাজটা।

এবার মনে পড়ল, ভাল করে মনে পড়ল, ও, আমাদের সেই হারুন! আমাদেরই কলেজ থেকে আই. এ. পাস করেছিল। গরীব ঘরের ছেলে, অনেক কষ্টে সৃষ্টে এ পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর পড়াশোনায় খতম দিয়ে চাকুরীর সন্ধানে নামল, কিন্তু এই দুর্দিনে চাকুরী পাওয়া কি সহজ কথা! শেষপর্যন্ত আমিই তাকে আমাদের এই প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কয়েকটা বছর এখানে কাজ করেছিল, শিক্ষক হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিল। পাঁচ-ছ বছর বাদে একদিন হঠাৎ কোনো কিছু না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেল, তারপর আরও তিন-চারিটি বছর কেটে গেছে। আজ এতদিন বাদে কোথেকে এল সেই হারুন? ও, তুমি হারুন! কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? এতদিন ছিলে কোথায়?

বাংলাদেশ কথা কয়

হারুন সংক্ষেপে তার গত কয় বছরের ইতিহাসটা বলল, এতদিন নিজের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করছিল। কিন্তু ক'মাস আগে স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম যখন জোর বেঁধে উঠল, তখন 'জয় বাংলা' বলে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কোথায় রইল তার স্কুল, কোথায় বা ঘর-সংসার। তার পর থেকে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে আর পথে পথে তার ভ্রাম্যমাণের জীবন কাটছে।

বললাম, সে তো ভাল কথা। কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থা এমন হয়েছে কেন? আন্দোলন তো আমরাও করছি হে, কিন্তু তোমার মত—মনে হচ্ছে কতকাল যেন তুমি খেতে পাও না।

সত্যি কথাই বলেছেন স্যার, নিয়মমত খাবার খুব কমই জোটে। মাস দেড়েক হয় পশ্চিমা সৈন্সরা আমাদের ওখানে এসে জেঁকে বসেছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম হামলা করে চলেছে আর তাদের সঙ্গে জুটেছে একদল ফেউ—মুসমিল লীগের গুণ্ডার দল। আমাদের ওখানকার মুক্তিবাহিনী আমিই গড়ে তুলেছিলাম। ওরা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে গেছে, তাই আমার জন্ম এবং আরও কয়েক জনের জন্ম সারা এলাকা জুড়ে পাতি পাতি করে খোঁজাখুঁজি চলছে। সবাই সন্ত্রস্ত, কেউ ভয়ে জায়গা দিতে চায় না। কি মনে হয় জানেন? মনে হয় যেন নিজের দেহের মাংসগুলোকে খেয়ে খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। তাই তো শরীরের এমন হাল হয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম, একটু আগে বলেছিলাম, আমরাও তো আন্দোলন করছি হে—সেই কথাটা মনে করে ভেতরে ভেতরে একটু লজ্জা বোধ করছিলাম। সেও আন্দোলন করছে আর আমরাও আন্দোলন করছি, কিন্তু এক যাত্রায় এমন পৃথক ফল কেন? সে করছে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে, সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। আর আমার আন্দোলন শৌখীন আন্দোলন, আমি সংসারের সব দিক রক্ষা করে

অনুকূল বাতাসে পাল তুলে চলেছি। ইতিপূর্বে এই কথাটা আর কখনও এমন করে মনে হয় নি।

হারুন, তুমি কিছু খেয়ে নাও আগে, তার পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

সত্যি কথাই বলেছেন স্যর, আপাতত একপেঁট বোঝাই করে খেয়ে নেওয়াটা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে সেই জন্তই আমি এতদূর থেকে আপনার কাছে আসি নি। আমার কাজের কথাটা শুনুন আগে —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না, আগে খেয়ে নাও, তোমার যা কিছু কথা আছে, পরে শোনা যাবে। কথা বলার সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি ভেতরের ঘরে চলে এলাম, এমন অসময়ের অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হবে শুনে গৃহিণীর মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। আমি মুখটাকে কাঁচুমাচু করে বললাম, আমার ভাগেরটা না হয়—

থাক থাক, তোমার এত বেশী বিবেচনা না দেখালেও চলবে। তুমি যাও, আমি বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে গেলাম, একটু বাদেই খাবার এল। খাবার আসার সাথে সাথেই হারুন ক্ষুধার্ত পশুর মত তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চক্কুলজ্ঞার অবসর নেই তার, সামনেই পানি ছিল, কিন্তু সে হাতটা ধুয়ে নেবার প্রয়োজনটুকুও বোধ করল না। কোনোদিকে না তাকিয়ে গো গ্রাসে গিলে চলল। দেখে মনে হচ্ছিল এমন ভাল খাওয়া সে যেন অনেকদিন খায় নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর আলাপ হ'ল। হারুন বলছিল, স্যর, আমার বাড়ি এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে। নিজের এলাকা ছেড়ে এতটা পথ ভেঙে আপনার কাছে কেন এসেছি শুনুন তবে। এসেছি

বাংলাদেশ কথা কর

অস্ত্রের খোঁজে। আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা আছি, কিন্তু অস্ত্রের মধ্যে আছে তিনটি অচল আর সচল রাইফেল। এদিকে রাইফেল আছে তো কাতুঁজ ফুরিয়ে গেছে। ওদের মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমরা কি দিয়ে লড়াই করব? অস্ত্রের অভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনী ভেঙে যেতে বসেছে। খালি হাতে তো আর লড়াই করা চলে না। তাদের মন ভেঙে যাচ্ছে। ফলে কেউ কেউ চলে গেছে বর্ডারের ওপারে, আর যারাও বা আছে তারাও এদিকে ওদিকে কেটে পড়ছে। সেই জন্তুই বলছি, আপনার তো রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকের সাথে যোগাযোগ আছে। আপনি যদি তাদের বলে-কয়ে আমাদের জন্তু কিছু অস্ত্র যোগাড় করে দিতে পারেন—

হতাশ হয়ে উত্তর দিলাম, আমাকে একথা বলা বৃথা হারুন, আমাদেরও এই একই অবস্থা। আমাদের এখানেও মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, বেশ কিছুদিন ধরে প্যারেড চলল, কিছুটা রাইফেল ট্রেনিং-ও হ'ল, কিন্তু হ'লে হবে কি, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আমরা অস্ত্র তুলে দিতে পারছি না। ওরা যখন আমাদের এখানে হামলা করতে আসবে, তখন আমাদের মুক্তিবাহিনী কি দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করবে, আজ শুধু আমাদের এখানেই তো নয়, সব জায়গাতেই এই একই সমস্যা।

আমার কথা শুনে হারুন একেবারেই চুপ মেরে গেল। অনেক আশা করে কতদূর থেকে এসেছিল, কিন্তু এখন মুখ কালো করে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কি করতে পারি আমি? এ ব্যাপারে আমিও যে ওদেরই মত অসহায়। হারুনও আমার অবস্থাটা বুঝল। তাই এই নিয়ে আর বেশী গীড়াপীড়ি করল না।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্তু প্রশ্ন করলাম, তোমার স্ত্রীর খবর কি, হারুন? হুমি তো ঘুরে ঘুরে বেড়াও, তার দিন কি ভাবে চলছে?

হারুনের জ্বী পরীবানুকে জানতাম। তার বাপ-মা তার 'পরী' নামটা বৃথাই দেয় নি। পরীর মতই সুন্দরী মেয়ে। শুধু রূপই নয়, রূপও আছে, গুণও আছে। কিন্তু ছ'জনের এই ছোট সংসারটুকুতে শাস্তি ছিল না। এটা ওটা নিয়ে ছ'জনের মধ্যে খিটিমিটি বেধে যেত। আর সেই খিটিমিটি যখন তখন তুমুল কলহের মধ্য দিয়েই রিস্কোরণের মতই ফেটে পড়ত। মনোমালিগ্নের প্রদাহটা যখন উচ্চতম তাপ-মাত্রায় গিয়ে পৌঁছত, তখন আমাদের হারুন মাস্টার মাঝে মাঝে সবার সামনেই গবেষণা করত যে, এমন বউ নিয়ে সংসার করা তার পোষাবে না, সে ওকে তালুক দেবে, আবার মাথাটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসত, ওসব কথা চাপা পড়ে যেত। এমনি ভাবে তাদের উর্মিমুখর জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছিল। এসব কথা ওদের পাড়ার লোকদের মুখ থেকে শুনেছি। আহা, পরের কথা ছেড়ে দিলাম, হারুন নিজেই কতদিন এসব কথা আমায় বলেছে। কিন্তু কোন সংসারে ঝগড়াঝাঁটি না হয়, এই সংসারের জোয়ালের তলায় বছরের পর বছর ঘেঁষাঘেঁষি আর ঠেলাঠেলি করে চলতে হলে স্বামী আর জ্বীর মধ্যে এমন ঠোকাঠুকি হবেই, না হয়ে পারেনা। হারুনকে অনেক করে জেরা করে করে যে-সমস্ত তথ্য পেয়েছি, তা থেকে মনে হয়েছে, এই পরীবানু মেয়েটির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অস্বাভাবিক স্বামী-জ্বীর মধ্যে সাধারণতঃ যেসব বিষয় নিয়ে বচসা বাধে, এদের বেলায় ঠিক তা নয়। পরীবানু সাধারণ ঘরের মেয়ে হলেও কিছুটা লেখাপড়া করবার সুযোগ পেয়েছিল। ওর মনে অনেক উচ্চাশা। সে চেয়েছিল রান্নাঘরের সঙ্কীর্ণ গাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে না থেকে বাইরের মুক্ত পরিবেশে আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে। এ যুগে সেটা দোষের কথা নয়, গুণের কথাই। তার মত আরো অনেক মেয়ের মনেই হয়তো এই ইচ্ছাটা গুমরে গুমরে মরে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মুসলমান

বা লাদেশ কথা কয়

ঘরের কুলবধুর পক্ষে সেই পথে এগোতে গেলে পদে পদে অনেক বাধা। এই উচ্চাশার পাখাটাকে ছড়িয়ে দিতে গেলে তার উপর প্রচণ্ড ঝাপড়ে। তখন হয়তো সেই উদ্ধত পাখাটাকে গুটিয়ে নিতে হয়, নয়তো চূর্ণ হয়ে যাবার আশঙ্কা। আছে জেনেও বিদ্রোহ করতে হয়। দ্বিতীয় পন্থাটাকে বেছে নেবে, পরীবাহ সেই ধাতের মেয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর কলহ-বিবাদের পেছনে এইটাই ছিল মূল কারণ। অন্ততপক্ষে হারুনের মুখে নানা উপলক্ষে ওর সম্পর্কে যে-সমস্ত কথা শুনেছি, তা থেকে আমার মনে এই ধারণাটাই গড়ে উঠেছিল। আজ কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। পরীবাহুর প্রসঙ্গটা তুলতেই সে তার প্রশংসায় আর আনন্দ-গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ওর মুখ যেন থামতে চায় না। ওর মত এমন মেয়ে নাকি হয় না। তার এই অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস দেখে না হেসে থাকতে পারলাম, না বললাম, কিন্তু হারুন, তুমি একদিন ওর সম্পর্কে—

সে-সব দিনের কথা রেখে দিন, স্যার। সেদিন যত কিছুই বলে থাকি না কেন, আজ এ কথা ভাল করেই বুঝতে পারি, সেদিন দোষটা ছিল আমারই। আমি দৃষ্টির ঘোরে নোজা জিনিসটাকে বাঁকা করে দেখতাম। সেই জগুই ওর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে চেপে রাখতে চাইতাম।

বিস্মিত হলাম। আমাদের এই সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের এই মনোভাব খুবই স্বাভাবিক ও সুলভ। কিন্তু তাই নিয়ে এমন সরল স্বীকারোক্তি ক'জন দিতে পারে! প্রশ্ন করলাম, তোমার এই দৃষ্টির ঘোর কবে থেকে কাটল এবং কেমন করে কাটল?

বেশী দিনের কথা নয়, হেসে বলল হারুন, মাত্র মাস কয়েক আগে আমাদের এবারকার এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সত্যটা প্রথমবারের মত আমার কাছে ধরা পড়ল। আন্দোলনের ভাবনায় ও কাজকর্মের ধাক্কায় মগ্ন হয়ে ছিলাম, ওর দিকে তাকাবার মত সময়

ছিল না, মনও ছিল না, এমন সময় এক দিন পরী আচমকা এক প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা, এই বাংলাদেশটা কি তোমাদের পুরুষদেরই, মেয়েদের কিছু নয়? আমাদের মেয়েদের নামগুলো কি শুধু সেন্সাস রিপোর্টের পাতা ভর্তি করে রাখবার জন্মই?

এ আবার কেমন প্রশ্ন! আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম, কেন, এই প্রশ্ন করছ কেন।

কেন? সে কথাও আবার জিজ্ঞাসা করছেন? এতদিন ধরে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন চলছে। আপনারা সভা করছেন, মিছিল করছেন, কিন্তু আমাদের মেয়েদের কোন্ দিন কোন্ কাজে ডাক দিয়েছেন?

একটু সময় চুপ করে রইলাম। সেই সংগ্রামী আবহাওয়ায় ওর কথাটা শুনে বড়ই ভাল লাগল। সত্য কথাই তো, মেয়েরা যদি আন্দোলনে আমাদের সাথে পথে বেরিয়ে আসে, তাহলে আমাদের শক্তি কতটা বেড়ে যাবে! সাথে সাথেই পুরানো দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই পরীবানুকেই একদিন উপদেশ দিয়ে একটু শাসনের সুরেই বলে ছিলাম, মেয়েদের স্থান ঘরে, বাইরে নয়। তথাকথিত 'সভ্য' মেয়েদের মত বাইরে গিয়ে মাতামাতি করবে, স্বেচ্ছাচার করবে, সেটা কোনমতেই আমি বরদাশ্ত করতে পারব না। কে জানে, পরীবানুও হয়তো সেই মুহূর্তে সেই কথাটাই ভাবছিল। কিন্তু সেই কথাটা স্বরণ করিয়ে দিয়ে সে আমাকে অপ্রস্তুত করতে চাইল না।

একটু ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়েরা কি এতদিনের পর্দা ভেঙে আমাদের সঙ্গে পথে বেরিয়ে আসবে? আমাদের সমাজ—

আমার কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল, আসবে না? কেন আসবে না? তাদের মন কি আসতে চায় না? তারা কি

আপনাদের মতই এ দেশের মানুষ নয়? আপনারা জোর করে দরজাটা বন্ধ করে রাখেন, তাই তারা বাইরে আসতে পারে না। দরজাটা খুলে দিয়ে তাদের ডেকে দেখুন না একবার।

এই বলে একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকাল সে। তারপর আবার বলল, আচ্ছা, আর সকলের কথা পরে হবে, আগে আমার কথাটাই হোক। আমি যদি আপনাদের সঙ্গে কাজে নামি, আপনাদের কোন আপত্তি হবে না তো? আবার এই নিয়ে সেই আগেকার দিনের মত আমাদের ছ'জনের মধ্যে যেন হাদ্দামা বেঁধে না যায়। বলেই সে একটু মুছ অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

পরীবারু নেমে এল কাজে। দিনের পর দিন নতুন নতুন মেয়েকে কাজের সাথী করে নিয়ে আসল। তার দলবল ক্রমশই বেড়ে চলল। বাধা দেব দূরে থাক, আমি তাকে সাগ্রহে আমাদের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে কখনও কাছে, কখনও বা দূরে, আমরা মনে মন মিলিয়ে কাজ করে চলে আসছি। স্যার, আপনি শিক্ষক, আমি ছাত্র, আপনার কাছে এসব কথা বলা হয়তো সাজে না। কিন্তু একটা কথা না বলে আমি থাকতে পারছি না। এতদিন আগে আমাদের ছ'জনের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার গভীর আশ্বাদ এবারই যেন প্রথম পেলাম। পরীবারুর উজ্জল হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, এটা যেন তারও মনের কথা। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে গ্রামে যাওয়া সম্ভব নয়। সে কোথায় আছে, কেমন করে দিন চলছে, তাও জানি না। তবে দেখা হয় না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে লোকমারফত চিঠিপত্রের চলাচল হয়।

উৎকর্ষার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, এই ছঃসময়ে একা মেয়েমানুষ কি ভাবে তার দিন চলছে? কি লেখে সে?

হারুন বলল, সুখে নেই, সে কথা ঠিক, কিন্তু ওর মন বড় শক্ত, কোন কিছুতে ভেঙে পড়ে না। কি লেখে? সব চিঠিতেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে লেখে। একবার লিখেছিল, নিয়মমত খেয়েদেয়ে শরীরটাকে ভাল রাখবেন, একথা বলার মত পরিস্থিতি এখন নয়, তাহলেও বলছি, শরীরটাকে যতটা সম্ভব সুস্থ রাখতে চেষ্টা করবেন। আর এক কথা, খুব সাবধান, ওদের হাতে কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না। আমার জন্তু ভাববেন না। আমি মেয়েমানুষ। আমার পক্ষে অনেক সুবিধা, আমি পানি হয়ে এক রাশি পানির সঙ্গে মিশে আছি।

তোমাদের ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে কি লিখেছে?

সে কথা আর বলবেন না। কিছুদিন আগে ওর শেষ চিঠিটা পেয়েছি। তাতে লিখেছে, ওরা যেন আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কী-যে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। মাঝে মাঝেই এসে হামলা করছে। বাজার বন্দর জ্বালিয়ে ছারখার করছে। কোনো জোয়ান ছেলেকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায় শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঢুকে বয়স্থা মেয়েদের টেনে নিয়ে যায় ওদের ঝাঁটিতে। এসব দেখে দেখে আমার আর সহ্য হয় না। কিছু একটা করবার জন্তে পাগল হয়ে উঠি, কিন্তু কি করব, মনের আগুন মনেই চেপে রাখি। আল্লাহর কাছে আমার এই একমাত্র আরজ, মরবার আগে ওদের অন্তত একটাকেও যেন নিজের হাতে মেরে যেতে পারি।

এ পর্যন্ত বলে হারুন একটু থামল, তারপর আবার বলল, এইটাই ওর শেষ চিঠি। কিন্তু সারা চিঠিটার মধ্যে নিজের সম্পর্কে আর কোন কথাই নেই। কোথায় আছে, কেমন আছে, সে সম্পর্কে কিছুই লেখে নি। যে-লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল সে-ও সঠিক কোন কিছু বলতে পারল না।

বাংলাদেশ কথা কয়

আশ্চর্য মেয়ে, মনে মনে সে কথাই ভাবছিলাম। বললাম, হারুন, তুমি ওকে নিয়ে চলে এস আমাদের এদিকে। ওখানে থাকলে তোমরা ছ'জনেই মারা পড়বে। তার উপর তোমার যা চেহারা হয়েছে—

তা হয় না, স্যার। হারুন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। সবাইকে এমন বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমি কেমন করে এখানে চলে আসব। আর ওর কথা যদি বলেন তবে বলি, ও বড় শক্ত মেয়ে। ওকে কিছুতেই সেখান থেকে সরিয়ে আনা যাবে না। আমি নিজেও ওকে বলে দেখেছি, কিন্তু আমার এসব কথায় মোটে কানই পাততে চায় না। ভীষণ শক্ত মেয়ে, আর ভীষণ জেদী মেয়ে। এই ক'দিনের মধ্যে আমি ওকে ভাল করেই চিনে নিয়েছি। এখন আল্লাহর যা ইচ্ছা তা-ই হবে। আমি ওকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি—

সে রাত্রিটা হারুন আমার বাড়িতেই কাটাল। ইচ্ছা ছিল যাওয়ার সময় ওকে কিছু টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু সে সন্যোগ হ'ল না। সকালবেলা উঠে দেখি রাত্রি ভোর হবার আগেই হারুন কাউকে কিছু না বলেই তার নিজের পথে চলে গেছে।

এর কিছুদিন বাদে সেই হামলাকারী বর্বর সৈন্যরা নদী পাড়ি দিয়ে আমাদের এপারে এসে উঠল। তাদের প্রতিরোধ করবার মত কোন প্রস্তুতিই ছিল না। আমাদের মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যে যে-দিকে পারে ছুটল। আমিও সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে সরে এলাম। তারপর অনেক বাড়-বাপ্টার যা খেতে খেতে শেষপর্যন্ত বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কোথায় রইল হারুন, আর কোথায় রইল পীরবাহু, তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। বহু কষ্টে বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় কলকাতায় মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাই করে নিয়েছি। কোনমতে টানাটানি করে দিন চলছিল।

সকাল-বিকাল চায়ের দোকানে বসে চা খাই। আর চায়ের টেবিলের উপরে যে-খবরের কাগজটা থেকে, তা থেকে বাংলাদেশের খবরা-খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। লুপ্তিতা, ধর্ষিতা, বাংলাদেশ আর তার এই পলাতক সন্তানের মধ্যে এটুকুই শুধু সম্পর্ক। একদিন একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের প্রতিরোধের এক বিচিত্র কাহিনী।

গ্রামটা আমার কাছে পরিচিত না। হ'লেও মনে হ'ল হারুনদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও হবে। সারা অঞ্চলটার উপর মিলিটারী জেঁকে বসেছিল। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হত্যা আর অত্যাচারের তাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন তিন জন রাইফেলধারী সৈন্য বিকাল বেলা শিকারের আশায় এক জনবহুল পল্লীর ভিতরে ঢুকল। দেখতে দেখতে পথ জনশূন্য হয়ে গেল, ছ'দিকের বাড়ীর দরজা-জানালাগুলো বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। সৈন্যদের সন্ধানী দৃষ্টি শিকার খুঁজে খুঁজে ফিরছিল। চলতে চলতে ওরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড়ার ভেতর থেকে চার-পাঁচটি তরুণী সেজেগুজে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যদের দেখে ওদের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের ভাব নেই, মুখের হাসিতে আর চোখের কটাক্ষে ওরা তাদের আমন্ত্রণের গুঢ় সংকেত জানাল। মুগ্ধ পতঙ্গের দল সেই মেয়েদের পেছন পেছন অনুসরণ করে তাদের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আর এই মেয়েরা জেনে-শুনে, স্বেচ্ছায় তাদের পশু-প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল।

সন্ধ্যা ছাড়িয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসছিল। দীপ-শিখার স্তিমিত আলোকে সেই সেই স্বৈরিগীরদল সৈনিকদের মুখের কাছে পানপাত্র তুলে ধরল। সেই সুধা-পানের ফলে ওদের চেতনা একটু একটু করে ঝিমিয়ে পড়ছিল। উপযুক্ত মুহূর্ত বুঝে সেই স্বৈরিগীরা রণরঙ্গিনীর মূর্তি ধরে লাফিয়ে উঠল, তারপর ধারাল দা

বাংলাদেশ কথা কয়

দিয়ে ওদের কুপিয়ে কুপিয়ে কাটল যারা শত শত নিরীহ লোকের
রক্তে তাদের হাত লাল করেছে, সেই ঘাতকের দল তীব্র যন্ত্রণায়
চীৎকার করে উঠল। কিন্তু তাদের রক্ষা করবার জন্য কেউ এগিয়ে
এল না। এই ভাবে তিন জন সশস্ত্র সৈন্য এই মেয়েদের হাতে
মারা পড়ল।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রতিরোধ-কাহিনীটি আমার মনকে প্রশ্নে
প্রশ্নে উদ্ভাস্ত করে তুলেছিল। এই ঘটনা কি সত্য, না কল্পিত কাহিনী !
এই ঘটনা কি সত্য হতে পারে? আমাদের ঘরের মেয়েরা কি
কখনও এমন কাজ করতে পারে? দেশের শত্রুদের ধ্বংস করবার
সঙ্কল্প নিয়ে, দীর্ঘকালের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত সতীত্বের সহজাত
সংস্কারকে কি তারা এমন করে অতিক্রম করে যেতে পারে?

কিছুদিন বাদেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে গেলাম। ধারাবাহিক
হত্যা আর অত্যাচারের ফলে যে-সমস্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে
শরণার্থী কলকাতায় চলে আসছিল, ঘটনাচক্রে তাদের মধ্যে এক-
জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে সে
বলল, হ্যাঁ ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্য, এই ঘটনাটা আমাদের পাশের
গ্রামে।

তবে এই ঘটনাটি সম্পর্কে তার কাছে থেকে আরও কিছুটা বেশী তথ্য
সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। সে বলেছিল, সেই সৈন্যদের হত্যা
করার ব্যাপারে একটি মেয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বয়স যে
তার খুব বেশী তা নয়, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ছোট-বড় অনেকেই
তাকে 'আপা' বলে ডাকত। মুক্তিবাহিনীর একজন বিশিষ্ট নেত্রী
বলে সে তার নামটা সবার কাছে প্রকাশ করতে চাইত না। কিন্তু
তাহলেও তার আসল নামটা আমাদের কাছে চাপা ছিল না।

কি তার নাম? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

পরীবাহু।

কি, কি, কি, কি বললেন তার নাম—পরীবানু ?

হ্যাঁ, পরীবানু ।

এক মুহূর্তে কত কিছু কথা মনে পড়ে গেল । কিন্তু পরীবানু কি এই সংসারে মাত্র একজনই আছে ?

আবার প্রশ্ন করলাম, সে দেখতে কেমন ? আপনি দেখেছেন কোনদিন তাকে ?

না তাকে দেখি নি আমি । তবে শুনেছি, তিনি খুবই সুন্দরী । লোকে বলে, পরীবানু পরীর মতই দেখতে ।

তারপর কি হ'ল পরীবানুর ? সে কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে ? বেঁচে আছে বলে মনে তো হয় না । সৈন্যদের লাশ তিনটাকে গুম করে ফেলে দিয়েছিল বটে কিন্তু খবরটা ওদের কাছে পৌঁছতে দেয়ী হয় নি । সঙ্গে সঙ্গে ওরা এনে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলল । আলিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল গ্রামটাকে । যাকে পেয়েছে, তাকেই মেরেছে । এর মধ্যে কে কে বাঁচল আর কে মরল, তার হিসেব কে দেবে ! আমরা তার পরেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছি ।

পরীবানুর মুখে ছবিটা আমার গোথের সামনে ভেসে উঠল । আর একখানি মুখ । এ মুখ হারুনের, আমার এই সংবাদাতাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের ওই অঞ্চলের হারুন-মাস্টারকে চেন তুমি, মুক্তিবাহিনীর হারুন-মাস্টার ?

সে উত্তর দিল, আমাদের ওই অঞ্চলের হারুন-মাস্টারকে চেনে না এমন লোক নেই । চিনি বই কি । তাকে চেনে না ওই অঞ্চলে এমন লোক আছে বলে তো মনে হয় না ।

তার খবর কি ? ভাল আছে তো সে ?

ভাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন ? আজকালকার দিনে ভাল থাকাটা বড় কঠিন । বিশেষ করে হারুন-মাস্টারের মত লোকদের পক্ষে । খবরটা সঠিক কিনা বলা কঠিন, তবে একটা কথা শোনা

বাংলাদেশ কথা কয়

যাচ্ছে, সে নাকি রাজাকারদের হাতে মারা পড়েছে। এরপর তার কাছে আর কোন প্রশ্ন করি নি।

রাত্রিবেলা আমার স্ত্রী হালিমার কাছে পরীবাহুর কাহিনীটা খুলে বললাম। হালিমা নিঃশব্দে আমার কথা শুনল, শোনার পরে তাকে চুপ থাকতে দেখে তার মনোভাব সম্পর্কে কেমন একটা খটকা লাগল। একটু বাজিয়ে দেখবার জন্ম বললাম, আশ্চর্য মেয়ে পরীবাহু! আচ্ছা হালিমা, তুমি সত্যি করে বল দেখি, এ অবস্থায় তুমি এমন একটা কাজ করতে পারতে?

হালিমা এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। ফোঁস করে উঠল। বলল, আমি করব এমন কাজ! ছি ছি, এমন একটা কথা বলতে পারলে! কোন ভাল ঘরের ভাল মেয়ে এ কাজ করতে পারে না। এরা আদালত জাতের মেয়ে।

এবার চুপ করে থাকার পালা আমার। একটু সময় চুপ করে থেকে বললাম, সত্যি কথাই বলেছ হালিমা। এরা আদালত জাতের মেয়ে। এদের চিনে ওঠা আমাদের সাধ্য নয়।

অন্য ডায়েরি তথ্য

ইলিয়াস আহমদ

আমি নির্বাচনের দিন বিকেলে ঢাকায় মেয়েদের একটি পোলিং
রুমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সন্তান ক্রোড়ে এক উদ্বেগাকুল
ভদ্রলোক আমাকে থামালেন।

বললেন, আপনি তো ভেতরে যাচ্ছেন, সেখানে আমার স্ত্রী
রয়েছেন। আমার এই কোলের মেয়েটি তাঁর কোলেই থাকার
কথা। কিন্তু ভোট দিতে অসুবিধে হবে বলে লোপাকে আমার কাছেই
রেখে যান। চার ঘণ্টা হ'ল তিনি লাইনে। মেয়েটিকে বোতলের
দুধ খাইয়েছি। কিন্তু দুধ খেয়েই মেয়েটি বমি করে কেমন নেতিয়ে
পড়েছে—দেখছেন? এখন হয়তো তার মায়ের বুকের দুধ পেল
একটু চান্স হয়ে উঠতে পারে। আমি অনেক ডাকাডাকি করেছি।
স্ত্রী আসেন নি। পুরুষ মানুষ বলে ভেতরেও ঢুকতে সাহস করছি
না। আপনি তো প্রার্থী। ঐ যে দেখা যাচ্ছে তিনিই আমার স্ত্রী।
আপনি একটু বুঝিয়ে বললেই তিনি বাইরে আসবেন।

আমি ভেতরে ঢুকেই মহিলাকে বাইরে যেতে বিনয়ের সাথে
তনুরোধ জানালাম। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই গুটি গুটি
করে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এগুচ্ছিলেন। এবার আমি বললাম,

বাংলাদেশ কথা কয়

আপনার মেয়েটির অবস্থা খারাপ। আপনি বাইরে যান দয়া করে। এবারও মহিলা আমার মুখের দিকে তাকালেন না। আমি এর পরে বললাম—নৌকা মার্ক। বাজ্ঞে একটি ভোট কম হলেও চলবে। আপনি আপনার সম্মানকে দেখতে যান। এবার মহিলা আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। মহিলার চোখে রক্তের আভাস ঘেন।

সক্রোধে তিনি বললেন, আমার সম্মান মরে গেলেও আমি লাইন ছাড়ব না। ভোট আমি দেবই। আপনার কথায় তো ভোট দিতে আসি নি? আপনার কথায় লাইন ছাড়ব কেন? এ উত্তরের পর আমি লাইনের মাথার দিকে তাকালাম। দেখলাম, আমার নানী শাশুড়ি লাইনের মাথায়। কুজ দেহ। লাঠির ওপর ভর করে কোন রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লাঠির মাথায় শেখ মুজিবের একটি ছবি। কেউ হয়তো লাগিয়ে দিয়েছে।

আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম। তারপরই নানী শাশুড়ির কাছে যেয়ে তাঁকে লাইন থেকে সরিয়ে এনে তাঁর জায়গায় মহিলাকে প্রায় জোর করে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

আমার বৃদ্ধা কুজ আত্মীয়া মহিলার জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। আমি মহিলার ভোট দেওয়া সাক্ষ হওয়ার পর তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে স্বামী হাতে সংগে দিলাম। মুহূর্তের ঝটকায় স্বামীর কোল থেকে বাচ্চটাকে প্রায় কেড়ে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তাকে তরে তুললেন।

একটি বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ভিয়েতনাম-লাওস খ্যাত জনৈক সংবাদদাতার সাথে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় একটি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আলাপ হচ্ছিল। পাঁচ-সাতটানা আকৃতির ক্যামেরা তার কাঁধে। পরনে হাফ প্যাণ্ট আর পায়ে গামবুট। টেপ

রেকর্ডারের মাউথ-পিসটা পকেটে নেতিয়ে রয়েছে। আমাকে একটি হাভানা সিগার বাড়িয়ে দিয়ে নিজে আর একটি ধরিয়ে ক্যাম্পের ভেজা মাটির ওপর চেপে বসে পড়লেন। মুক্তিবাহিনীর একজন লুডিপরা সৈনিক আমাদের ছ'জনেকে এনামেলের তরকারির বাটিতে করে ছ'কাপ ছুধহীন চা দিয়ে গেলেন। সৈনিকটি পঁচিশে মার্চের আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজির শেষ বর্ষের ছাত্র ছিল।

চা-য়ে একটি আরামের চুমুক দিয়ে 'আঃ' করে একটি তৃপ্তির শব্দ তুললেন বিদেশী সাংবাদিক। তারপর বললেন, আমি এখন ভারত সীমান্তের শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ফিরছি। আমার সাথে চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে ছিল। তাকে ক্যাম্প থেকে নিয়ে গিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে তার মায়ের সাথে দেখা করিয়ে আবার তার ক্যাম্পে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি এই ছেলেটির চাইতে কম বয়সী মুক্তিগোনা আর দেখি নি—বাংলাদেশের কোন মুক্তিফৌজ ক্যাম্পে নয়, ভিয়েতনামের কোন ভিয়েৎ কং ক্যাম্পেও নয়। সে যখন রাইফেলটি তার কাঁধে ঝুলিয়েছিল তখন তার বাঁটটি তার গোড়ালি ছুঁই ছুঁই করছিল। কিন্তু তার তাক অব্যর্থ। বাম চোখে নিশানা করলে গুলিটি চোখের পাতায় লাগবে না, একেবারে রাজ্যবিন্দু করবে। বিত্তশালী শিক্ষিত ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র সন্তান ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে নীচু ক্লাসের ছাত্র ছিল। রাইফেল ক্লাবে নিয়মিত স্মাটিং প্রাকটিস করত।

ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বিপরীতে ছিল তাদের দোতলা বাড়ি। একজন বাঙালী বিত্তশালী শৌখিন পরিবারে যথাকার কথা, তার সবই ছিল। টেলিভিশন, রেডিওগ্রাম, দামী রেডিও, সেগুনের আসবাবপত্র, কাপে'ট, আরো কত কি! অনেক স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তাদের সংসার। ছেলেটির মা সংসারে একটি মেয়ের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেন। পাড়ার অন্য বাসার ছোট ছোট

বাংলাদেশ কথা কয়

মেয়েরা এলে গভীর আবেগে তাদের আদর করতেন, খাওয়াতেন। যাওয়ার সময় হাতে হুঁচারটে টফি-লজেন্স তুলে দিতেন। তাদের থেকে আবার আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করতেন। এশিয়া, আফ্রিকায় যেখানে অনভিপ্রেত অব্যাহত মনে হলেও বন্ধ্যায় তোড়ের মতো সম্ভান আসে, সেখানে ছেলেটির মার একটি মেয়ের অভাব পূরণ হয় নি। তাই ছেলেটিকে ঘিরেই মা-বাপের স্বপ্ন অর্কিডের মতো আকাশ ছোঁয়ার স্পর্শ করত।

পঁচিশে মার্চের আগে একটি পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত এক লাখ বাষট্টি হাজার টাকা ভদ্রলোক উঠিয়ে নেন। আশঙ্কা ছিল ব্যাংক লালবাতি জ্বালাবে! আর পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকে বাঙালী টাকা রাখবেই বা কেন! সব টাকা উঠিয়ে তাই ঘরে রেখে দেন।

তারপর এল সেই ভয়ংকর রাত। চার দিকে শুরু হ'ল আক্রমণ। আমেরিকান সৈন্যরা ভিয়েৎনামে যে-সব অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায় তেমনি সব অস্ত্র। সর্বাধুনিক সব অস্ত্র। আমি দীর্ঘ সাত বছর আমার নিউজ এজেন্সির জন্যে সংবাদ সরবরাহ করেছি ভিয়েৎনাম থেকে। এর আগে আমেরিকার মেরিন ফোর্সের আমি অফিসার ছিলাম। স্মরণীয় শব্দ শুনেই আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম সব ধরনের সামরিক সমরাস্ত্রই পাঞ্জাবী জল্লাদরা ব্যবহার করছে নিরস্ত্র বাঙালীদের ওপর। আমি সারারাত ঢাকায় হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালের ছাদে ছিলাম। রাত বারোটার সময় রিপোর্শনে এসে দেখি, থাকী ইউনিফর্মধারীরা লাউঞ্জে গিজগিজ করছে। হিংস্র হায়েনার মত তাদের চেঁখ অল্ অল্ করছে। কন্টিনেন্টালের সামনের ক্ল্যাগ মার্শে তখনও উড়ছিল কালো পতাকা আর স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। হুঁটুই নামিয়ে তারা পুড়িয়ে দেয়। রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাঙালী কর্মচারীদের অমানুষিকভাবে পেটাতো

লাগল। পরে খবর নিয়েছিলাম, প্রথমে হোটেলে ঢুকেই ক্রিপ্ত কুকুরের চাইতেও পাশব উদ্বেজনায় পাঞ্জাবী দৈত্যরা অনেককে ধরে নিয়ে সামনের বটগাছের তলায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এরপরও যারা পালাতে পারে নি তাদের ওপর চলে নির্দয় নির্যাতন। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে।

আমি-যে ছেলেটির কথা বলছি তার বাবারও অপরাধ, তিনিও বাংলা ভাষায় কথা বলতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডের কালেকশন ছিল। বাঙালি বলে নিজেকে ভাবতে গর্ববোধ করতেন। আর কিছু নয়। রাজনৈতিক আঙিনায় কোনদিন তাঁর পদক্ষেপ পড়ে নি। তাঁর রাজনীতি ছিল তিনি বাঙালি। তাই রাত বারোটায় তাঁর দোতলা বাড়িতে আক্রমণ চালান হয়। ছেলেটি জানালা দিয়ে দেখল একজন অবাঙালি মুসলমান সৈন্যদের বাড়িটি দেখিয়ে দিচ্ছে। সামনের ছোট স্টেশনারি দোকানের মালিক ছিল সে। ছেলের বাবা-মা সব কেনাকাটাই করতেন সে দোকান থেকে।

এ দৃশ্য দেখার পর ছেলের বাবা, ছেলে আর তার মাকে ছাদে উঠিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ছাদ থেকে তারা টের পেল খান সেনারা ঘরে ঢুকছে এবং কুকুরের মত চিৎকার করছে। তারপর হঠাৎ গুনল সে তার বাবার করুণ আর্তনাদ। সাইরেনের মত উর্ধ্ব শব্দগুলো তাদের কানে এসে আছড়ে পড়ছিল। তার বাংলা হ'ল—ছয় দফা চেয়েছিলে? বাঙালি কুম্ভার বাচ্চারা। ছয় দফা বলার একটি লোককেও অবশিষ্ট রাখব না। লেও ছে দফা। তারপর ছেলেটির বাবাকে ফ্লোরে শুইয়ে ছ'জন পাঞ্জাবী পশু ছ'দফার প্রতীক হিসেবে দেহের ওপর বুট সমেত ছ'বার ঝাঁপিয়ে পড়ে থেতলে তাঁকে হত্যা করেছিল।

ছাষিবেশে মার্চ ছেলেটি তার কয়েক ঘণ্টা পূর্বের সধবা কিন্তু হঠাৎ বিধবা হয়ে যাওয়া মাকে নিয়ে নীচে নেমে পিতার নাড়িভূড়ি বের

বাংলাদেশ কথা কয়

হওয়া বিকৃত বীভৎস দেহ দেখে বিকট চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফ্লোরে পড়ে যায়। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিল জানে না। হঠাৎ চোখ মেলে দেখে তার বিধবা মা তখনও অজ্ঞান। মুখের কোল বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। তারপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি মায়ের চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিতে লাগল। কতক্ষণ পরে মা চোখ খুলে তাকিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সে কি কান্না। যেন হিমালয়ের উচ্চতা থেকে নদী নীচের দিকে ছুটে চলেছে।

তখনই তারা পালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবটুকু উঠিয়ে নিয়ে গেছে। হাতের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল। দেখল সোনার কয়েকটি চুড়ি ছ'হাতে রয়েছে। তাড়াতাড়ি সব খুলে ফেলে কোমরে গুঁজে নিল। এমন সময় শুনল ভারী বুটের শব্দ। তাড়াতাড়ি গিয়ে তারা বাথরুমে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ পরে বুটের শব্দ মিলিয়ে গেলে বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে দেখে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটি গায়েব। একজনের স্বামী আর একজনের বাবার কবরে ছ'ফোঁটা চোখের জল ফেলারও সুযোগ দিতে নারাজ ইয়াহিয়া-টিক্কারা।

ছেলেটির বাবা তাঁর দেশের বাড়িতে তার কবরের জায়গা ঠিক করে রেখেছিল। একটা বকুল গাছের নীচে। ছায়া-ঘেরা জায়গা। ছায়া-ঘেরা কবরে চির নিডায় থাকতে চেয়েছিলেন। এখন পাই-কারি গোরস্থানে শায়িত। কোথায় তিনি সমাহিত কেউ অর কোনদিন বলতে পারবে না।

পালাবার আগে টাকা নেবার পাল। কিন্তু কিছুই যে নেই। ছবু'বুদের ভয়ে টেলিভিশনের মধ্যে এক লাখ আর রেডিওগ্রামের মধ্যে বাষটি হাজার টাকার নোট রেখেছিলেন। টেলিভিশনও নেই, রেডিওগ্রামও নেই। সারা বাড়ি খুঁজে এক শ' পনের টাকা ঘোগাড় করল তারা। তারপরেই যাত্রা শুরু করল অনির্দিষ্টের

পানে। এসে ঠেকল আগরতলায়। এখানেই এখন মায়ের বাস।
ছেলেটি থাকে ক্যাম্পে। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে।

ছেলেটি এই ক্যাম্পের সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত
হচ্ছে। এরা যখন কোন অপারেশনে যায় তখন ছেলেটিও সাথে
যায়। লক্ষ্যবস্তুর ওপর প্রথম গুলীবর্ষণের অধিকার ছেলেটির। সে
তার থ্রু নট থ্রু রাইফেল থেকে প্রথম গুলি ছোঁড়ে শত্রুর ওপর।
তারপর শুরু হয় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আক্রমণ।

ক্যাম্প থেকে বেরুব এমন সময় কম্যাণ্ডার আমাকে একটি
অনুরোধ জানালেন। তিনি ছেলেটিকে ভারত সীমান্তের কোন
এক শরণার্থী শিবিরে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আবার মুক্তি-
ফৌজ ক্যাম্পে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ
জানালেন।

কম্যাণ্ডার পঁচিশে মাচের আগে সেনাবাহিনীর মেডিকেল
ক্যোরে'র অফিসার ছিলেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
থেকে এম. বি. বি-এস ডিগ্রী নিয়েছিলেন। এখন তিনি পুরোদস্তুর
ষোদ্ধা। যে-হাত স্টেথিস্কোপ কানে লাগিয়ে রোগীর রোগ নির্ণয়
করত এখন সে হাতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র। শত্রুর বক্ষ বিদীর্ণ করা
এখন তাঁর পেশা।

আমি আমার জীপে ছেলেটিকে উঠিয়ে নিলাম। অনেক কথা
জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু বিশেষ জবাব পেলাম না। দৃষ্টি যেন
এখানে নয়, ওখানে নয়—কোন স্তূপে। হয়তো সে তার বাবার
বুটের আঘাতে থেঁৎলানো দেহের বীভৎস দৃশ্য দেখে চমকে চমকে
উঠছিল।

তার মা যে ক্যাম্পে থাকে সেখানে আমি তাকে নামিয়ে
দিলাম। বললাম—পনের মিনিট পরে আমি ফিরে আসব। তুমি
সামনে দাঁড়িয়েথেক। আমি ষোল মিনিটের সময় নির্দিষ্ট স্থানে এসে
আমার ভাড়া করা জীপ দাঁড় করলাম। দেখলাম, ছেলেটি আমার

বাংলাদেশ কথা কয়

দিকে এগিয়ে আসছে। সে জীপে উঠে বসল। আমি জীপ ছেড়ে দিলাম।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা তোমাকে ছেড়ে দিল? যুদ্ধে যেতে দিল?

ছেলেটি বলল, আমি যতক্ষণ মায়ের কাছে ছিলাম মা সারাক্ষণ আমাকে ছোট ছেলের মত বুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন। আমার দুঃখী মা আমাকে সারাক্ষণ উদ্ভাপ দিয়েছিলেন। সে উদ্ভাপের ভাষা ছিল।

মা, আমার মা আমাকে আর কিছু তো বলেন নি। আমি যখন বললাম, 'আমি ক্যাম্পে যাচ্ছি, মা তখন আমায় এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।'

*

*

*

এই দুই মায়ের কাহিনীই আমার দুই সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকে শোন।। তাঁরা সযত্নে তাঁদের ডায়েরিতে টুকে রেখেছেন। আমি এই দু'কাহিনীর মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটাতে পারি নি। বার বার মনে হয়েছে, এটা বাংলাদেশের একই মায়ের কাহিনী। আপনাদের কি মনে হবে জানি না।

সময়ের প্রয়োজনে

জহির রায়হান

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম।

ক্যাম্প-কমান্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই।

তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধান একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে সেখানে।

খাতাটা খুললাম।

মেয়েলী ধরনের গোটা গোটা হাতে লেখা।

মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনও চোখের কোণে এক ফোঁটা অশ্রুও হয়তো জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কি জানি, হয়তো অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই। মৃত্যুর

বাংলাদেশ কথা কয়

খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে
ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলাটার ওপরে এসে দাঁড়াই।
সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি
লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু ছলছে। কয়েকটা ধান ক্ষেত। ছোটো
তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি
পেতেছে ওরা। একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। এক সঙ্গে
থেকেছি। গুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে
গল্প করেছি। প্রয়োজন বোধে ঝগড়া করেছি। ভালবেসেছি। আজ
তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে
ওঠে। হাত নিস্পিস্ করে। পাগলের মত গুলি ছুঁড়ি।
মারার জন্তে মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে
ফেটে পড়ি। ঘণায় থু থু ছিটোই মৃতদেহের মুখে।

সামনে ধান ক্ষেত। আলের ওপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল।
একটানা ডাকছে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের
দিকে। কি যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। সন্দেহে যুহুতে' দৃষ্টি
স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প-কমান্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার মনে হচ্ছে ওরা এগুতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসেব কষছিলেন। মুখ
তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত ছ'রাত ঘুমোন নি।
অবকাশ পান নি বলে। তিনি তাকালেন।

বললেন, কি দেখছ?

বললাম, মনে হ'ল একটা মুভমেন্ট।

ভুল দেখেছ। আমাদের মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের
ছ'একদিনের মধ্যে এগুবার কথা নয়। যাও, ভাল করে দেখ।

এলাম নিজের জায়গায় । একটানা তাকিয়ে থাকি । মাঝে
মাঝে তন্দ্রা এসে যায় । দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে । হয়তো তাই ভুল
দেখি ।

কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে-দৃশ্য
দেখেছিলাম সেটা ভুল হবার নয় । শুনেছিলাম, বহু লোক আশ্রয়
নিয়েছিল ঝানে । যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই ।

দেখলাম

মেঝেতে পুডিং-এর মত জমাট রক্ত ।

বুটের দাগ ।

অনেকগুলো খালি পায়ের ছাপ ।

ছোট পা । বড় পা । কচি পা ।

কতগুলো মেয়ের চুল ।

ছুটো হাতের আঙুল ।

একটা আংটি ।

চাপ চাপ রক্ত ।

কালো রক্ত । লাল রক্ত ।

মানুষের হাত । পা । পায়ের গোড়ালি ।

পুডিং-এর মত রক্ত ।

খুলির একটা টুকরো অংশ ।

এক খাবলা মগজ ।

রক্তের ওপরে পিছলে যাওয়া পায়ের ছাপ ।

অনেকগুলো ছোট-বড় ধারা । রক্তের ধারা ।

একটা চিঠি ।

মনি ব্যাগ ।

গামছা ।

এক পাটি চটি ।

বাংলাদেশ কথা কর

কয়েকটা বিছুট।

জমে থাকা রক্ত।

একটা নাকের নোলক।

একটা চিরুনি।

বুটের দগ।

লাল হয়ে যাওয়া একটা শাদা ফিতে।

চুলের কাঁটা।

দেশলাইয়ের কাঠি।

একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।

রক্তের মাঝখানে এখানে ওখানে অনেকগুলো কাতু'জ ছড়ানো।

পাশের নদ মাটা বন্ধ।

রক্তের স্রোত লাভার মত জমে গেছে সেখানে।

দেখছিলাম।

দেখে উর্ধ্বাঙ্গে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে।

আমি একা নই। অসংখ্য মানুষ।

অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মত ছুটছিল।

মাথায় স্ট্রটেকস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হ্যারিকেন।
কোমরে বাচ্চা।

চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।

কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকোয়
করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের
ওপরে গুলি করেছে। 'তিন শ' লোক মারা গেছে ওখানে।

যাবেন না।

মনে হ'ল পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মণ পাথর বেঁধে দিয়েছে
কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিস্মল মুহূর্ত।
কোন দিকে যাব। পেছনে ফিরে যাবার পথ নেই! মৃতদেহের
স্তূপের নীচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছি নে। সেখানেও হয়তো
মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন্ দিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায়
সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে
ছুটছে। কাঁচকি মাছের মত চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার উপরে নেমে এল।

তারপর।

তারপর মনে হ'ল একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ
থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনছি। অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব।
মেশিনগানের শব্দ।

বাচ্চার কান্না। কতগুলো মানুষের আত'নাদ। কাতরোক্তি।
কয়েকটা কুকুরের চীৎকার। কান্না। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের
বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বা'জান বা'জান?
হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ডাকছে সে। বা'জান বা'জান।
তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা।
ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে
পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল চারপাশে
অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। কিংবা
মারা যাচ্ছি।

বাংলাদেশ কথা কয়

সামনে ধানক্ষেত । একটা লাউয়ের মাচা । কচি লাউ ঝুলছে ।
পেছনে কয়েকটা বাঁশবন । আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু । একটা
পুরনো দালান । ওখানে আমরা থাকি ।

মোট সাতাশ জন মানুষ ।

প্রথমে উনিশ জন ছিলাম , আট জন মারা গেল মর্টারের গুলিতে ।
ওদের কবরে নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা
এগারো জন ।

একজন পালিয়ে গেল সে রাতে । গেল আর এল না । আর
একজন মারা গেল হঠাৎ অসুখ করে । কি অসুখ বুঝে উঠবার
আগেই হাত-পা টান টান করে গুয়ে পড়ল সে । আর উঠল না ।
তার বুক-পকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম । মায়ের কাছে লেখা ।
মা । আমার জন্ম তুমি একটুও চিন্তা করো না, মা । আমি ভালো
আছি ।

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি । থাক । ওখানেই থাক । তখন
ছিলাম ন'জন । এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁচেছি ।

সাতাশ জন মানুষ ।

নানা বয়সের । ধর্মের । মতের ।

আগে কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না । পরিচয় ছিল না ।
চেহারাও দেখি নি কোনদিন ।

কেউ ছাত্র ছিল । কেউ দিন-মজুর । কৃষক । কিংবা মধ্যবিত্ত
কেরানী । পাটের দালাল । অথবা পদ্মাপারের জেলে ।

এখন সবাই সৈনিক ।

একসঙ্গে থাকি । খাই । ঘুমোই ।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোন শত্রুর সন্ধানে বেরোই
তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বছদিন ধরে চিনি । জানি । অতি
আপনজনের মত অনুভব করি ।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ
আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝে মাঝে
বিশ্বামের মুহূর্তে' গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা।

অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

টুকিটাকি নানা আলোচনা।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। ক'দিন ধরে শুধু ডাল-ভাত
চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হ'ত না। সাতাশ জন
মানুষ আমরা। মাত্র ন'টা রাইফেল। আরো যদি অস্ত্র পেতাম।
সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন
ওদের একজন সৈন্তকেও পালিয়ে যেতে দিতাম না।

মোট দু'শ জনের মত এসেছিল ওরা। পঁয়তাল্লিশটা লাশ পেছনে
ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত।
গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ছেলে-বুড়ো-মেয়ে
গেরস্তাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে। কারো হাতে ঝাঁটা। দা।
কুড়োল। খুন্তি।

মৃতদেহগুলোর মুখে ঝাঁটা মারছে ওরা।

কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে ওদের হাত। পা।
মাথা। বৃকের পাঁজর। দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একটি মৃতদেহকে
শত টুকরো করতে করতে জনৈক বৃদ্ধ চীৎকার করে কাঁদছিল।
আমার পুলাডারে মারছস। বউডারে নিয়ে গেছস। মাইয়াডারে
পাগল করছস। আমার সোনার সংসার পুড়ায় দিছস।

আল্লার গজব পড়বো। আল্লার গজব পড়বো।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

বাংলাদেশ কথা কয়

আমরা বাধা দিলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডুকে কেঁদে উঠল
ওরা। করুণ বিলাপ শুরু করল। বিলাপের অবসরে নিজেদের
সহস্র ছঃখ-বেদনার ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগল।

ছেলে নেই। স্বামী নেই। স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। যুবতী মেয়েটাকে
ধরে নিয়ে গেছে। তিন মাস হল। হালের গরু। গোলার ধান।
গায়ের অলঙ্কার। কিছু নেই। সব লুট করেছে।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

এত সব বুকে নিয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। একটা বিস্ফোরণে
যদি সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার
চেষ্টা করতে পারত ওরা।

ওরা একা নয়। অনেকগুলো মানুষ। সাড়ে সাত কোটি। এক
কোটি লোক ঘর বাড়ি মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। তিন কোটি লোক
সারাক্ষণ পালাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

ভয়। ত্রাস। আতঙ্ক।

জ্ঞান ফিরে এলে আমিও পালিয়েছিলাম। পোড়ামাটির ভ্রাণ
নিতে নিতে। অনেকগুলো মৃতদেহ ডিঙিয়ে। কালো ধূঁয়ের
কুণ্ডলি ভেদ করে।

একটা গহনা নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলে বুড়ো মেয়ে
বাচ্চাতে গিজগিজ করছিল সেটা।

ছ'পাশের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা প্লেন এসে একটানা বোমাবর্ষণ করেছে
সেখানে।

কাছেই একটা মফস্বল শহর। এখনও পুড়ছে। কালো জমাট ধূঁয়ো
কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। একটা মানুষ
নেই। কুকুর নেই। জন্তু-জানোয়ার নেই। শূন্য বাড়িগুলো প্রেত-
পুরীর মত দাঁড়িয়ে। সহসা অনেকগুলো মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা

গেল। তাকিয়ে দেখলাম। দূরে নদীর পারে একদিকে জড় হয়ে
দাঁড়িয়ে কতগুলো মেয়ে চিৎকার করে নৌকাটাকে পারে নিয়ে
যাওয়ার জন্তে ডাকছে। ওরা আশ্রয় পেতে চায় নৌকাতে। না
না, খবরদার, নৌকা ভেড়াবে না। জনৈক বৃদ্ধ ওদের দিকে তাকিয়ে
খেকিয়ে উঠল।

কেন, কী হয়েছে ?

কি আর হবে ? বাজে মেয়ে। বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে মানে ?

মানে আবার কী সাহেব। বেশ্যা। বেশ্যা চেনেন না। ঘৃণায়
চোখ-মুখ কুচকে এল তার।

তার একার নয়। অনেকের।

অনেকেই মুখ বার করে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যাগুলোকে
দেখল। না না। নৌকা থামাবার দরকার নেই। আপদগুলো
মরুক। মরলেই ভাল।

নৌকা থামাও। সহসা ভীড়ের ভেতর থেকে একটা ছেলে চীৎকার
করে উঠল। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তজবার মত লাল
চোখ। শিগ্গির নৌকাতে তুলে নাও ওদের। কঠিন কণ্ঠে আদেশ
করল সে। উত্তরে বুড়োটা বিরক্তি প্রকাশ করল। না, নৌকা
থামাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে এসে বুড়োটার গলা চেপে ধরল
ছেলেটা। কুত্তার বাচ্চা। তোমাকে এক্ষুণি তুলে ঐ নদীর জলে
ফেলে দেব আমি। কোন্ শালা গুয়ের বাচ্চা আছে এখানে
বাধা দেয় আমাকে। নৌকা ভেড়াও মাঝি। ওদের তুলে নাও।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। নৌকা ভিড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে অর্ধমৃত বেশ্যাগুলো ভেড়ার পালের মত নৌকায়
এসে চড়ল।

বাংলাদেশ কথা কয়

ছোট বেশা। মাঝারি বেশা। বড় বেশা।

কিশোরী বেশা। যুবতী বেশা। বৃদ্ধা বেশা।

ঘুগায় একপাশে সরে গেল নৌকার কুলীন যাত্রীরা। বেশারা কোন কথা বলল না। এক কোণে গাদাগাদি করে বসল।

অনেকগুলো মুখ।

একটি মুখ আমার মায়ের মত দেখতে।

মা এখন কী করছে?

মায়ের কথা মনে পড়তে বুকটা ব্যথা করে উঠল।

ছোট ভাই। বোন। ইতুদি। ওরা কেমন আছে?

বেঁচে আছে না মরে গেছে?

জানি না। হয়তো বহুদিন জানব না।

তবু একটা কথা বার বার মনের মধ্যে উকি দেয় আমার।

আবার কি ওদের সঙ্গে একসাথে নাস্তার টেবিলে বসতে পারব আমি?

আবার কি রোজ সকালে মা আমার বন্ধ ছয়ায়ে এসে কড়া নেড়ে ডাকবে? কিরে, এখনো ঘুমোচ্ছিস? অনেক বেলা হয়ে গেল যে। ওঠ। চা খাবি না?

কিংবা।

দল বেঁধে সবাই বাড়ির ছাতের ওপরে কেরাম খেলা। পারব কি আবার?

অথবা।

মাকে সাক্ষী রেখে, সবাই মিলে বাবার পকেট মারা? হয়তো। জানি না।

জানতে গেলে ভাবনা হয়। ভাবনাটাই একটা যন্ত্রণা। অথচ ভাবতে আমি এককালে ভীষণ ভালবাসতাম। বিশেষ করে জয়াকে নিয়ে। চিলু ভাবীর বোন জয়া। কতভাবে ভেবেছি ওকে।

কখনো সমুদ্রের উত্তাল পটভূমিতে ।
 কখনো ঢেউজাগানো মিছিলের মাঝখানে ।
 কখনো ছেঁট একটি ঘরের একান্তে । দিনে । রাতে ।
 অন্ধকারের নিবিড়তায় ।
 কিংবা কোন ছপুরে । কোন রেস্তোরার কোণের টেবিলে ।
 নিরিবিলি নিজ'নে । ছ'কাপ চা সামনে রেখে অনেকক্ষণ ধরে
 কোন কথা না বলে বসে থাকার মুহূর্তে । ভাবতে ভালো
 লাগত ।
 ইছামতি, করতোয়া, ময়ূরাক্ষী বলে ঘে-নদীর নাম, তার জলে
 দু'জনে সাঁতার কেটে ঢেউয়ের সঙ্গে কানামাছি খেলতে ।
 জয়া কোনদিন সমুদ্র দেখে নি । সমুদ্র দেখার বড় ইচ্ছে ছিল তার ।
 একদিন হাসতে হাসতে বলল, জানো, সমুদ্র দেখে এলাম । কখন !
 কোথায় ? অবাক হয়েছিলাম আমি ।
 কেন, এই শহরে ? কপালে জন্মে ঠাট্টা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো ঝাঁচল
 দিয়ে মুছে নিয়ে বলেছিল জয়া । শহরের অলিতে গলিতে এত
 সমুদ্রের ছড়াছড়ি জীবনে দেখেছ কখনো ?
 জনতার সমুদ্র ।
 সমুদ্রের চেয়ে গভীর ।
 সাগরের চেয়েও উত্তাল ।
 গতিময় ।
 মন হচ্ছিল সামনে যত বাধার পাহাড় আসুক না কেন, সব বিছু
 ভাদিয়ে নিয়ে যাবে ।
 কোটি কোটি মুখ । পাথরে খোদাই করা চেহারা । মৃষ্টিবদ্ধ হাত
 সীমানা ছাড়িয়ে । লক্ষ-কোটি বজ্রের শব্দ কিংবা ঢেউয়ের ধ্বনি
 সে মিছিলের গর্জনের কাছে অর্থহীন ।
 আগে তো দেখি নি কোনদিন ।

বাংলাদেশ কথা কয়

বাহানর ফেক্সারিতে । চুয়ানতে । বাবটি, ছেষটি কিংবা উনসত্তরে
অনেক দেখেছি ।

কিন্তু এত প্রাণের জোয়ার কখনো দেখি নি ।

এতো মৃত্যুও দেখি নি আগে ।

সামনে তাকাই । বিরাট আকাশ । কয়েকটা লাউরের মাটা ।
কচি লাউ ঝুলছে । কয়েকটা ধানক্ষেত । দুটো তালগাছ ।
দূরে আর একটা গ্রাম ।

প্রতিদিন দেখি ।

জয়াকেও এত নিবিড় করে দেখি নি কোনদিন । পেছনে কয়েকটা
বাঁশবন । আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু । একটা পুরনো দালান ।
সে দালানের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট বেখা
এঁকেছি আমরা । ওগুলো মৃতের হিসেব ।

আমাদের নয় ।

ওদের ।

যখনি কোন শত্রুকে বধ করেছি, তখনি একটা নতুন বেখা টেনে
দিয়েছি দেয়ালে । হিসেব রাখতে সুবিধে হয় তাই । প্রায়ই দেখি ।
গুণি । তিন শ' বাহানুর, তিয়াস্তুর, চুয়াস্তুর । পুরো দেওয়ালটা
কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি ।

আমাদের যারা মরেছে । মরেছে তাদের হিসেবও রাখি । কিন্তু
সেটা মনে মনে । মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ । সেটাও মাঝে
মাঝে গুণি ।

একদিন ।

বেশ কিছুদিন আগে । সেক্টর-কমান্ডার এসেছিলেন আমাদের
ক্যাম্পে, দেখতে । সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা ।

অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে। তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

কেন যুদ্ধ করছ বলতে পার ?

প্রায় এক ধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।

বলেছিলাম, দেশের জন্ত। মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্যে। বাংলাদেশ।

না। পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয় নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি আমরা। উত্তরটা ঠিক হ'ল কি ?

দেশ তো হ'ল ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজার বার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তা'হলে কিসের জন্যে লড়ছি আমরা ?

বন্ধুবা নানাজনে নানারকম উক্ত করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মত মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওই শালারা! বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়াবার জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, কেন লড়ছি জান ? দেশের মধ্যে যত গুণ্ডা-বদমাশ ঠগ, দালাল, ইতর, মহাজন আর ধর্ম-ব্যবসায়ী আছে তাদের সবার পাছায় লাথি মারতে।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

বাংলাদেশ কথা কর

কিসের জন্যে লড়ছি আমরা ? এত শ্রাণ দিচ্ছি, এত রক্ত কর
করছি ?

হয়তো সুখের জন্তে । শান্তির জন্তে । নিজের কামনা-বাসনা-
গুলোকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্তে ।

কিংবা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে । নিজের অস্তিত্ব রক্ষার
জন্তে ।

অথবা, সময়ের প্রয়োজনে । সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্তে
লড়ছি আমরা ।

না ।

অতশত ভাবতে পারি না । আমার ছোট মাথায় অত ভাবনা এখন
আর ধরে না । ব্যথা করে ।

যেটা বুঝি সেটা সোজা । আমাদের মাটি থেকে ওদেরকে তাড়াতে
হবে । এটাই এখনকার প্রয়োজন ।

দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে ।

মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন ।

হাতের কব্জিতে এসে একটা গুলী লেগেছিল কাল । সেটা হাতে
না লেগে বুকেও লাগতে পারত । মাত্র ছ'আঙুলের ব্যবধান ।

এখন ক'দিন বিশ্রাম ।

মা কাছে থাকলে হয়তো মাথায় হাত বুলিয়ে দিত । কাঁদত ।
বকুনি দিয়ে বলত । বাহাছর । অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি
কেন ? সবার পিছনে থাকতে পারলি না ? গিয়েছিলি কেন ?
সবার পেছনে থাকতে পারলি না ? আর অত বাহাছরির দরকার
নেই বাবা । ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল ।

ঘর ?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড় অদ্ভুত।
ঘর-বাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা
ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন
চলে গেছে। হয়তো কোন গ্রামে, কোন গঞ্জে। কোন উদ্বাস্তু
শিবিরে। কিংবা -

না। ওটা আমি ভাবতে চাই না।

জয়ার কোন খবর নেই। কোথায় গেল মেয়েটা ?

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়তো
পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার
গ্রামে। তখন হয়তো পরিচিত অনেকগুলো মুখ সেখানে থাকবে
না। তাদের আর দেখতে পাবো না আমি। যাদের পাবো তাদের
প্রাণ ভরে ভালবাসবো।

যারা নেই কিন্তু একদিন ছিলো, তাদের গল্প আমি শোনাব
ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বৃকে মাইন বেঁধে যে ট্যাকের সামনে ঝাঁপিয়ে
পড়েছিল।

কিংবা, সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মুহূ
হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসে নি। অথবা উদ্বাস্তু
শিবিরের পাঁচ লক্ষ মৃত শিশু।

দশ হাজার গ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়ানো এক কোটি
মৃতদেহ।

না, এক কোটি নয়। হয়তো হিসেবের অঙ্ক তখন তিন কোটিতে
গিয়ে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ কথা কয়

এক হাজার এক রাত কেটে যাবে হয়তো। আমার গল্প তবু
ফুরোবে না।

সামনে ধানক্ষেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি
লাউ ঝুলছে। ছোটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের
নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা
আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প কমান্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কার
লেখা, আপনার?

না। আমাদের সঙ্গে একজন মুক্তিযোদ্ধার।

তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি? আবার প্রশ্ন
করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্ত কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন
তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে
গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মেরে ফেলেছে।
বেঁচেও থাকতে পারে হয়তো।

চোখজোড়া অজান্তে যাবার খাতাটার ওপরে নেমে এল। অনেকক্ষণ

উন্টেপাণ্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম
বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে।
কয়েকটা ধানক্ষেত। তুটে। তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম।
সেখানে আগুন জ্বলছে।

শেষ বাজি

কারেন্স আই মেদ

না, আমি মরুম না।

শুয়েছিল সে। উচু পাড়ের চারপাশে বুনো আগাছা, আম, খেজুর
নারকোল, নোনা আর পাড় ঝাঁপিয়ে নেমে আসা ডালপালা নিয়ে
একটা ডুমুর গাছ।

সেই আগাছার ঝোপের আড়ালে, ডুমুর গাছের গোড়ায় কাত হয়ে
হেলান দিয়ে সে শুয়েছিল। ডান পায়ের গোড়ালির ওপর হৃৎসহনীয়
যন্ত্রণা এখন দপ দপ করছে। পায়ের নীচে, ভিজ়ে মাটিতে ক্ষরিত
রক্ত যেন উপুড় করে দেওয়া দেয়াতের কালি।

মাথা বিম বিম করে। সমস্ত শরীরে ছনিয়াজোড়া ক্লান্তি। আর
তখন হাওয়ার শব্দ ওঠে। যেন একটা বিরাট বালিহাঁসের বাঁক
পাড়ের ওপাশের অব্যবহৃত মাঠ মাঠের শেষে দাঁড়িয়ে থাকা দিগন্ত-
রেখার নিখর কালো নিসর্গের ওপার থেকে ডানায় শব্দ তুলে উঠে
আসছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়া মাটি, গাছপালা, ছেঁড়া ছেঁড়া
কালো মেঘ, পুকুরের পানি, পায়ের নীচে জমে থাকা রক্ত, তার
নিঃশ্বাস আর শরীরের ঘামে একাকার হয়ে যাওয়া একটা
মিশ্রিত গন্ধ।

না, আমি মরুম না।

কাকের চোখের মতো পুকুরের পানি শিরশিরিয়ে ওঠে।

কিঁদেটা এখন তার শরীরের কোথাও একটা ক্লান্ত জানোয়ারের
মতো পড়ে আছে। আর ডান পায়ের গোড়ালির ওপর থেকে ভোর
বেলাকার সেই ত্রুষ্ক যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে রয়েছে সারা শরীরে।

সেই সাথে একটা বিপুল অবসাদ তাকে যেন হাজার হাজার ফিট নীচু খাদে একবার ঘাড় গুঁজে চেপে ধরছে, আবার ওপরে তুলে আনছে। যন্ত্রণা, পেটের ভেতর মরে যাওয়া ভারী হয়ে থাকা ক্ষিদে ক্লান্তি, অবসাদ এই সবকিছুর মিলিত অনুভূতির ভেতর ডুবে যেতে যেতে সেই তীব্র, দুর্বিনীত ইচ্ছাটা তাকে জাগিয়ে দিচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। না, আমি মরুম না।

একপাশে কাত হয়ে অনেকক্ষণ পড়ে আছে। নড়েচড়ে একটু পাশ ফিরে ডান পা'টা সরাতে চাইল, পারল না। সমস্ত পা'টা ভারী হয়ে আছে। একটু নড়তে গেলেই যন্ত্রণায় মাথার রগ ছিঁড়ে আসতে চায়। ঠোঁট কামড়ে, মাটির ওপর ছ'পাশে হাতের ভর দিয়ে ডুমুর গাছ থেকে পিঠ আলাগা করে কোনমতে সামনের দিকে সরে এল। এখন সে সম্পূর্ণ একটা মানুষ, চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে। বাঁ পায়ের ওপর আহত ডান পা'টা তুলে দিয়েছে সম্ভরণে। মাথা, পিঠ, কোমর, উরুতে ভিজে মাটির স্পর্শ। কিন্তু এভাবে থাকলে আহত পায়ে টান ধরে, যন্ত্রণা তীব্রতর হয়। সুতরাং খুব ধীরে সাবধানে পাশ ফিরে বাঁ পায়ের হাঁটু এবং গোড়ালির ওপর ডান পা স্থাপন করে। এই সংক্ষিপ্ত পরিশ্রমে তার ক্রুর ওপর ও নাকের ডগায় বিনবিনে ঘাম জাগে।

বাঁ হাত ত্রিভুজের মতো করে করতলে মাথা রেখে ঘন আগাছার ফাঁক দিয়ে সে চেয়ে থাকে মাঠের দিকে।

ফসলহীন রিক্ত মাঠে এখন কেবল এপ্রিলের হাওয়া, ভোর রাতে এখানে মানুষের, ক্রমাগত মানুষের ব্যাকুল পদচারণা ছিল।

কুন্তার বাচ্চারা। দাঁতে দাঁতে ঘষে। ডান পায়ের ক্ষত বারুদের মতো দপ দপ করে।

মনে মনে হিসেব করল, দশটা। আর দুইটা অইলে তিন হালি পূরা অইবো। মানে এক ডজন। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ কথা কয়

পাশে পড়া স্টেনগানে হাত রাখল। আর তখন দৃশ্যগুলি একের পর এক আসতে থাকে।

লোকে আমারে গুণ্ডা কয়। ডরায়। হ, আমি গুণ্ডা, ওয়াগন লুট করি। মানুষ খুন করি মদ খাই, জুয়া খেলি, খানকি পাড়ায় যাই। খুনের মামলার ফেরারী আসামী আমি। লোকে আমারে ডরায়। গেন্দু তরে আমি মার্ডার কইরা ফেরার। পুলিশ আমারে খুঁইজা পায় নাই।

হেইবার আশরোবরে খুন কইরা কেসে ফাইসা গেলাম আর তুই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিছিলি। তর বড় হাউস অইছিলো আমারে কাসিতে বুলানের। মামলা টিকলো না। আমরা ছ'জন আসামী বেকসুর খালাস পাইলাম। কিন্তু মইদে থেইকা তুই বেহুদা জানটা খোয়াইলি।

হ, আমি গুণ্ডা, ওয়াগন লুট করি, খুন করি, মদ খাই, জুয়া খেলি, খানকি পাড়ায় যাই। মানুষ ডরায় আমারে। সামনে আমার হাইসা খাতির কইরা কথা কয়। পিছে কয় হারামীর বাচ্চা। স্লোগ পাইলে চাকু হান্দায়া দিবার পারে। কিন্তু আমি মরি নাই। আবার হিসেবটা মেলায়, পাঁচ দিনে দশটা, মানে একদিনে দুইটা কইরা।

কেমন একটু হাসি পেল তার। কিন্তু হাসল না। চোয়াল দুটো শক্ত হ'ল। চোখের ভেতর ক্রোধের পেছনে বেদনার ছায়া কাঁপে। নিথর কালো পুকুর পাড়ে আগাছা আর গাছপালার আড়ালে প্রায় শুকনো, ভিজে শক্ত মাটিতে গুলী খাওয়া আহত পা'র বিরতিহীন যন্ত্রণা, সারাদিনের ক্ষুধা ক্লান্তি, আর অবসাদ। নিয়ে এপ্রিল মাসের এই নির্জন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় চোখের সামনে সে এখন তার আবাল্য পরিচিত শহরের ভিন্নতর ছবি দেখছে। বিধ্বস্ত, দগ্ধ, রক্তাক্ত।

দেখতে দেখতে ক্ষুধার্ত, অবসাদগ্রস্ত, যন্ত্রণার্ত শরীর থেকে শক্ত,
গোটানো লোহার মতো হাত দুটো যেন এইমাত্র বেরিয়ে এসে
স্টেনগান চেপে ধরল, তর মেলেটারির মায়েরে বাপ!

তার আহত পা'র যন্ত্রণা, মাথার ভেতর বোঁ বোঁ করা শূন্যতা,
শরীরময় আচ্ছন্ন ব্যথা ভুলে সে তখন উঠে বসে পড়েছে। ছ'চোখের
অলস্ত অঙ্গারে যেন ঝুলন্ত অন্ধকারের পর্দাটা পুড়িয়ে দেবে। অথবা
সামনে যেন সেই হতে হয়ে ফেরা নেকড়েগুলোর একজন কিংবা
কয়েকজনকে স্টেনগানের গুলীতে লুটিয়ে দেবে এখনই।

পাঁচ ছ'গুণে দশ। আর ছইটা অইলে তিন হালি। আমরা
তিনজন আছিলাম, অহন আমি একা। কিন্তু মরি নাই।

কেমন যেন দম আঁটকানো চাপা স্বরে দাঁতে দাঁতে ঘষে, থেমে থেমে
বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, তর মেলেটারির মায়েরে বাপ!

আমারে ঘেরাও দিয়া ধরব। ছোঃ।

বাড়ির পেছনে ম্যাথর প্যাসেজ দিয়ে, নদী পার হয়ে পঞ্চম দিনের
রাত্রে সে সোজা এপারে চলে এসেছিল। তারপর আজ ভোর
রাতে হঠাৎ এপারেও হামলা। আবার সেই কান্না, আর্তনাদ
চিংকার, ধারাবাহিক গুলীর শব্দ, আগুন।

কিন্তু আমি মরি নাই।

একখান পা জখম অইছে। তাইতে কি, হাত দুইটা অহনও
তৈয়ার! আর....পরম মমতায় সে স্টেনগানটা স্পর্শ করে।

তারপর চিং হয়ে শুয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নিল। এপ্রিলের শুকনো,
পানি পাওয়া মাটি থেকে একটা সৌদা সৌদা গন্ধ উঠছে। সেই
গন্ধ তার চৈতন্যের সর্ব অবয়বকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে। সেই
সাথে মাথায় ওপর নিঃসীম আকাশ, চারপাশের গাছপালা,
হাওয়ায় কাঁপা পুকুরের তিরতিরে শ্রোতে স্বল্পালোকিত জ্যোৎস্না,
গাছপালার ফাঁকে হঠাৎ উধাও মাঠ, সেই মাঠের প্রান্তসীমায় নিখর

বাংলাদেশ কথা কয়

নিবিড় প্রকৃতি, এই সবকিছুর ভেতর সে যেন জন্ম জন্ম ধরে মিলে
মিশে একাকার হয়ে আছে।

ছোটবেলার কথা, মা'র কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতর কি যেন
আঁকুপাকু করে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

আর তখন হঠাৎ শব্দটা জেগে ওঠে। উৎকর্ষ হয়ে শোনে। হ্যাঁ,
ক'জোড়া বুটগরা পা এগিয়ে আসছে। সে উঠে পড়েছে তখন।
উপুড় হয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে আমগছটাকে সামনে রেখে
স্টেনগানের নলটা একপাশ দিয়ে বাড়িয়ে দেয়।

তারপর সেই আগাছার ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে
স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। মিলিত পায়ের শব্দটা ক্রমেই
এগিয়ে আসতে থাকে যেন কত নদী-সাগর, কত পাহাড়-
পর্বত ডিঙিয়ে, বনজঙ্গল ভেঙে লোভ, ঘৃণা আর পৈশাচিক
নিষ্ঠুরতা নিয়ে এগিয়ে আসছে আর সে এই পুকুর-পাড়ের
সোঁদা সোঁদা গন্ধভরা মাটিতে বুক রেখে, চার পাশের এই
চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের ভেতর যুগ যুগ ধরে ছ'চোখে দুর্জয়
ইচ্ছা ছেলে জেগে আছে।

না, আমি মরুম না।

আলোক আন্দোলন

শওকত ওসমান

চোখের উপর একটু আলতো হাত বুলাতে পারলেও যেন এখন কিছুটা যন্ত্রণার উপশম হতো।

অসহ্য অস্থিরতা ভেতরে ভেতরে এত ঘুরপাক রত যে, সালামৎ আলি ঠিক হৃদিস করতে পারছিল না। এই মুহূর্তে যথা-প্রতিবেদ তার জন্তে কী আছে। হঠাৎ-ই মনে পড়ল অমন করস্পর্শের কথা, যদিও সচেতন ভাবে কিছু নয়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে হাত তুলতে গিরে সালামৎ নিদারুণ ভাবে অনুভব করলে, তার যো নেই।

হাতকড়ার শাসন ধমকে সব ঠাণ্ডা করে দিল।

কিন্তু সালামৎ সহজে পেছা হয় না। মাথা নিয়ে গেল সে নিজের হাতের চেটোর মধ্যে। সেখানে ছই ফেটি-বাঁধা চোখ ঘষতে লাগল।

হঠাৎ তার এমন নত মুখ পাঞ্জাবী প্রহরীর চোখ এড়ায় নি। সে ব্যাপারটা দেখেই চুপ করে যেতে পারত। কিন্তু তা দূরের কথা, বরং উন্টো গালাগাল ছুঁড়লে, ‘এই শালা, বাঙালীকা, বাচ্চা!’

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সালামৎ আলি। কিন্তু কান তো খোলা। তার বুঝতে দেবী হয় না, শাস্ত্রীর চোখ তার দিকে ঠিকই আছে। কিন্তু মাথা খসে পড়ছে, যে-মাথা করতালুর মধ্যে বন্দী তবু কিছু সোয়াস্তি পাচ্ছিল।

সালামৎ আলি তখন হঠাৎ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আর্টচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, তার চোখ এমনি ফেটি-বাঁধা।

বাংলাদেশ কথা কয়

পৃথিবী কেমন দেখতে? নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে বসে। তারপর জবাব নিজেই দিতে এগোয়। বহু অতীত তখন হুড়াহুড়ি থাকে। দিতে থাকে তার মনের ভাসমাস সমতলে জায়গার জন্তে। এই গুঁতোগুতি অনেকক্ষণ চলে।

ওদিকে চোখের যন্ত্রণাও চেপে বসছে। তবু হাতড়ে-ফেরা দৃষ্টি ফেটির মধ্যেই ছবি আঁকতে থাকে। অজস্র বৃদ্ধ, অজস্র রঙের শ্রোত কেবল অক্ষিপটের ভেতর দিয়ে হুহু চুকে যাচ্ছে গন্তব্যহীন যাত্রায়।

কিন্তু সে তো এক ঠিকানায় এসে পৌঁছেছে।

কোন জায়গায় তাকে মিলিটারিরা এখন আস্তানা দিয়েছে? তার একটা হৃদিস করা যেত। তবু কিছু শান্তি। ঢাকা শহরে তার জন্ম সেই একান্ন সনে। কুড়ি বছরে এই ছোট শহর জরীপে কিছু বাদ নেই তার। একটা জায়গার নাম পেলে সে যেন সব যন্ত্রণা ভুলে যেত। শান্তিনগর, মালিবাগ, শাঁখারিপাড়া, ইসলামপুর, রমনার কোন এলাকা? এ জায়গা ধানমন্ডির নয়াদাদ অভিজাত-পল্লীর কাছাকাছি কোথাও হোতে পারে না। বন্দীশিবির আর কোথাও নিশ্চয়। শহরের মাঝখানে এত লোক ধরে রাখবে, অত্যাচার মানুষকে ভয় দেখাতে এমনও হোতে পারে। কিন্তু হাতড়ে কিছু হেঁটে যেতে পারলে সে বুঝতে পারত, তার আস্তানার হৃদিস কি? মেঝে পাকা। আর কিছু বোঝার উপায় নাই। কারণ, ঠায় বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকা। কড়া হুকুম। এদিক ওদিক করলে সাইকেলের চেন পেটা করবে। ছাঁবার শান্তির রোলার তার দেহের উপর দিয়ে ঘষড়ে ঘষড়ে কিছু কাপড়, কিছু রক্ত, কিছু ছাল নিয়ে গেছে।

আর তাগদ বেশী নেই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা একটা দানা পড়েনি পেটে। তার জন্যে কোন আকসোস নেই। একবার দেখতে পেত সে পৃথিবী কেমন, তা হোলেই ক্ষুৎপিপাসা সব মিটে যেত।

বাইরের জগৎ শব্দ দিয়ে চেনা যায়। এখানে বড় সীমাবদ্ধ। জীপের যাতায়াত, স্টার্ট ধ্বনি আর ভারী বুটের আওয়াজ, কালো-ভদ্রে কথাবার্তা। এখানে যা মনুষ্যকণ্ঠ উচ্চারিত হয়, তা শুধু হুকুম। আর কিছু না।

নিকটে আশেপাশে লোক থাকলে, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা না হোক নিঃশ্বাসের বাতাস অন্ততঃ কিছু জানান দিয়ে যেত। সেদিক পর্যন্ত শূন্য। শাস্ত্রীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ হোতে পারত আহারের ব্যবস্থা থাকলে' তাও নেই।

অবিশিষ্ট ক্ষুধা যা প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সালামৎ আলি একবার অনুভব করেছিল। তারপর তার দেহ-যন্ত্রের আর কোন চাহিদা নেই। কেবল চোখ বেয়াড়। জিদী ছেলের মত বায়না নিয়ে মেতে আছে: আলো, এতটুকু আলো দাও। অতি ঝাপসা। হিমপ্রত্যুষের কুয়াশালেপা ক্ষীণতম আলো বা চোখ তেড়ে ধরতে হয়, এমন আলো।

এই প্রার্থনার জবাবে কিন্তু অন্ধকার কেবল ধেয়ে আসে, ঘনীভূত হয়—শেষে পুরু কালো পর্দার মত সামনে ঝুলে থাকে আর নড়ে না। এমন ঘনত্বের ধাক্কায় সালামৎ আলি মূর্ছা যেতে যেতে আবার সামলে নিত, অত সহজে নয়। একদিকের ঘাড় কাৎ করে কিছু বিশ্রাম। তার পরে আবার অগ্ন ঘাড়ে আশ্রয়। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার হেরফের।

তার জীবনে এখন শুধু বর্তমান আছে। মনে হয়, অতীত মুছে গেছে। অতীতের তাই ধর্ম। কিন্তু তার মরা দেহ, বকুলফুলের মত শুকিয়ে গেলেও সহজে সৌরভ হারায় না। বর্তমানে অতীত আর পূর্বের কলেবরে নেই। স্মৃতি যখন কসায়ের চাপট এবং যার উপর আঘাত হানে কুঁচি কুঁচি করে ছাড়ে আস্ত হাড় তখন চোখ বুঁজে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেহাই পেতে চাইলেও অসুবিধার মাত্রা শুধু বাড়ে। তার

চেয়ে খামখা চীৎকার দাও না কেন? ডুকরে কান্না বা গোঙানি যন্ত্রণা লাঘব করে এই ক্ষেত্রে। কিন্তু কান্না পুরুষ ন হুয়ের অলঙ্কার নয়। সালামং আলি তাই সাইকেলের চেন-টেটা হওয়ার সময় নিঃশব্দে কাৎরেছে। পেশী, মুখের বা যন্ত্রণাস্ত অণু অঙ্গের, সঙ্কুচিত করেছে বার বার, কিন্তু শব্দের ভুবনে ধরা দেয়নি।

এখন সঙ্গীরা অনুপস্থিত, কিন্তু ধরা পড়ার সময় তার কাছে ছিল। তিন চার জন। এমনি পথে তাদের সঙ্গে আলাপ। আর বিপদ তো পথেই তাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সবাই একে একে সরে গেছে। তা আর চোখে দেখা হয় নি, কারণ ফেটি বাঁধা। অনুভব করতে হয়েছে সালামংকে। অপরাধ এখানে সাধারণ সংজ্ঞায় চালু নয় - মার খেয়েছিল। বেদম মার। তখন গোঙাতে শুরু করেছিল। বিদ্রোহ করে উঠেছিল পাঞ্জাবী-প্রহরী “এই শালা বাঙালী কা বাচ্চা আওরং কা তরেহ রোতা হায়……না, মরদ, বুজদীল (ভীক) …।” সেইজন্মে সালামং চুপ করে আছে? না। সে জানে, শত্রু যেখানে জন্তুর অধম, সেখানে মানুষের মত ব্যবহার অনুচিত, অসঙ্গত। জন্তুকে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে হয়। আর অণু কোন রাস্তা সেখানে বন্ধ, তার তো সে যো নেই। তার হাত বাঁধা। কাছাকাছি প্রহরী আসে না। এলে একটা লাথি অন্তত দিত। তারপর যা হয় হোক! একবার সালামং আলির মনে হয়েছিল খুব কাছে পাঞ্জাবী নেকড়েটা, তার কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু কিছু তো দেখতে পাচ্ছে না সে। লাথি যদি ফস্কে যায়, খামখা হেনস্থা ডেকে এনে লাভ কি? সেইজন্মেই তো আলোর জন্মে যত প্রার্থনা। একটু আলো, চোখ ঈষৎ ফেটি-মুক্ত হোক, সে তো ধৃতরাষ্ট্র নয়। আলিঙ্গনের মধ্যে শত অস্ত্রের শক্তি জমাট। সালামং আলি তবু ভেবেছিল, একবার জাপটে ধরব, তারপর কয়েকটা ঘুষি। হাত ঠুঁটো, তা হিসেবে মধ্যে ধরে নি। নিছক প্রতিশোধপরায়ণতা মগজ ঘুলিয়ে দেয়।

চোখের কোটরে পেশীগুলো তড়পে উঠল, প্রথমে ধিকিধিকি, তার পর হঠাৎ দ্রুত কম্পন শুরু হয় চারিদিকে। কন্ধকাটা ভূত প্রেত ঢের বেশী সুখী। সালামৎ আলির মনে কথাটা খেলে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাকে কিছু ভাবতে হয় নি।

এখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সে খুলি চুরমার করে ফেলতে পারত।

কিন্তু কোথায় দেওয়াল? প্রাচীরের এত ভয় মানুষের, যদিও আততায়ীর আশঙ্কায় সে নিজের চারদিকে অমন কঠিন বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। আজব ধাঁধা! অস্তিত্বের। যা বিষ, তাই আবার বিষ-হর। মাত্রা, সময়, স্থান, পরিবেশের নকশা অনুযায়ী মূল্য বিচারে সব হের ফের হয়ে যায়।

আশে পাশে কোন দেওয়াল আছে কী? শাস্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু প্রশ্নের কোন বালাই ছিল না। পিপাসায় এক সময় ছাতি ফাটার উপক্রম, তবু পানি চায় নি সে প্রহরীর কাছ থেকে। গ্রামে এক খাল পার হওয়ার সময়ে সে স্রোতে মুখ ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই একবার মাত্র পিপাসার মোকাবিলায় জয়ী। এখনও জয়ী। কারণ আর পানির দরকার হয় নি।

ক্ষুধার মত পিপাসাও নেই। সব কামনা এখন আলোর জন্তে।

পৃথিবীকে দেখতে চাই একবার। কারণ, জন্মভূমি বাংলাদেশকে শেষবার না দেখলে মৃত্যু অর্থহীন থেকে যাবে। তাই ত আলোক প্রার্থী আমি। হে পুষ্প, তোমার সপ্ত অশ্ববাহিত রথে ঘরঘর আর আমি গুনতে পাই না কেন?

সালামৎ আলি আবৃত্তির আকারে উচ্চারণ করতে গেলে, গ্রীবার খসখস, যেহেতু নীরস, খুক খুক কাশি এসে যায় সহসা। কিন্তু প্রাণের প্রতিধ্বনি-মুখে কে হাত চাপা দিতে পারে? আলো, আলো নয়। তরঙ্গের সঙ্গী। একে অপরের বিকল্প না হলেও,

বাংলাদেশ কথা কয়

আলো ছাড়া আর কোন ঢেউ দেখা অসম্ভব। তাই ত এত প্রার্থনা, হে জবাকুসুম সঙ্কশি মহাদ্যাতি, একবার স্পর্শ দিয়ে যাও। ভক্তের নিবেদন শোনো....।

মুখের পেশী বিকৃত হতে লাগল সালামৎ আলির। এইবার মাথা বুঝি খসে মাটিতে পড়বে। হাওকাকের উপর সে কপাল রেখে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। একবার ঠেস দেওয়ার ইচ্ছায় সে একটু হেলেছে কি, তখনই সোজা হয়ে পড়ল আবার। এখানে দেওয়াল নেই, খাম নেই, হয়ত গরাদ নেই যার উপর হাত রেখে মাথা রেখে কয়েদারা চিরদিন সব অভিলাষ পরিপূর্ণ ভাবমূর্তি রূপে রেখে গেছে পৃথিবীর সব দেশে।

সালামৎ আলির হৃৎস্রাব আবার সহজ ভাবে ফিরে আসে।

এই এক বিচিত্র শত্রু। নিপীড়নের কন্দি ফিকির নয়, তার বর্বরমতপন্থা পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে। শরীরের সহন-ক্ষমতা অনেক দূর যায়, যদি অনুপ্রেরণা নয়, কেবল ছোটখাট অবলম্বন মেলে দুঃসহ যন্ত্রণার সময়। কয়েদখানার জানালার শিক, উদাহরণত, এই ধরনের সামগ্রী।

কিন্তু এখানে কিছু নেই। মরুভূমির মধ্যে এক চিলতে ঘেঘ পথভ্রান্তের শক্তি যোগাতে পারে। সালামৎ আলির অনুভূতি তাই হাতড়ে বেড়ায় যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়।

একবার চোখ মুখ কুঁচকে সে দমকা নিঃশ্বাস নিলে। বুকের পাঁজরে ফিক ব্যথা এসে জুটল, হাত দিয়ে সংবাহনের কাজ এখানে অল্প উপকারী। কিন্তু ঠুটো অবস্থায় সে কী করবে? তাই হাতকড়া নিয়েই দুই হাত বুকের উপর রাখলে। দম আটকে আসে থেকে থেকে। সালামৎ আলি গলার ভেতর ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ তুললে, জবাই ছাগলের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে! এই গুমরানি অনেকখানি সোয়াস্তি। কিন্তু শত্রু তার অসহায়তা দেখে আনন্দ পাবে, তা হয়

না। আবার গ্রীবা দেশ শব্দহীন। বন্ধ চক্ষু তেড়ে তেড়ে ফেটির কিনারা ছোঁয় মাত্র এবং ব্যথায় আরো নোঁতিয়ে পড়ে। সালামৎ আলির বক্ষস্পন্দন পর্যন্ত অতি টিমে হয়ে যায়। মাথার ভেতর চক্ষুর লাগে। সালামৎ ভাবলে, বোধ হয় মৃত্যু সন্নিকট। কিন্তু এই চিন্তা এক জায়গায় আটকা থাকতে পারে না, বরং হঠাৎ উবে যায়।

স্মৃতির পঙ্গপাল মগজের চারপাশ চেয়ে বসে পড়ে।

বিশ্বাসঘাতকতা তাকে জল্লাদের হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাগী মুসলিম লীগারের মুখটা সে দেখতে পেল। ফিচেল ছুঁচোলো মুখ, কৃশ চেহারা, তাই আবার বেটে-খাটো। এই গুয়োরের বাচ্চা আবার তার প্রভুদের কায়দায় নামের শেষে বিক্রমপুরী জুড়েছিল। ধূর্তামি ওর চোখে মুখে স্পষ্ট। চিরকুমার। সমাজের জঘ জীবন বিকিয়ে দিতে পারত খুব সহজে। মহৎ নামে পরিচিত হোত কিন্তু সব সময় সে সমাজ-বিরোধীদের দোসর। ছোকরাবাজ রূপে প্রসিদ্ধ ছিল সে বিক্রমপুর তল্লাটে। আজও খসলৎ বর্তমান আছে। এই বয়সে, বাটের উধে', এখনও বিক্রমপুরী কারো ক্ষতি সাধন, বিশেষত দেশের ক্ষতি সাধন করবে, বাংলাদেশে যখন কসাইয়ের দোকান তা ভাবা যায় নি। কিন্তু সে-ই পাঞ্জাবী প্রভুদের আমন্ত্রণ দিয়ে এনেছিল এই অঞ্চলে।

ইসলাম পার্টির ধর্মবজী দালালগুলো সঙ্গে জুটেছিল। নচেৎ অমন অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে তার খোঁজে রাতে পঞ্চনদবাসী মি লিটারি হাজির হতে পারে, তা অবিশ্বাস্য।

কত মুখের মিছিল দ্রুত শূন্যতার রাস্তা অতিক্রম করে। মানুষের আধিপত্য সেখানে প্রধান নয়। বাড়ির পোষা কুকুরটা, অস্বাভাবিক শব্দ তুলে তার অনুগমনে কতো দূরে এসেছিল। এক সিপাই গুলি করে তার প্রভুবিচ্ছেদের বেদনা আর স্থায়ী হতে দেয় নি। নভো-চারী কৃশ সারমেয় লাইকার নামে সেও কুকুরের নাম রেখেছিল।

বাংলাদেশ কথা কর

একটা জন্তুমুখ এই অন্ধকার, এই আলো—এমন ছাড়াছাড়া খাদ আর পথের পালাক্রম সান্নিধ্যের মত—ভেসে উঠতে লাগল, যেমন নদীতে স্নানের সময় তার অভ্যেস ছিল। কুকুরের মধ্যেও মানবিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গী দশজন পাঞ্জাবী সিপাই, এগুলো মুসলমান....মুসলমান...কুকুরের কাছাকাছি কোন কালেও যেতে পারবে না।

চীৎকার দিতে গিয়ে ঢোক গিললে সালামং আলি। মগজ এখন বড় পরিষ্কার। কিন্তু চিরকালের করুণাপরায়ণ মন এবং যার জন্তে সে রাজনীতির ভেতর ঢুকেছিল, হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নিলে আপন স্বভাবের বেগে। এ গুলোর আর অপরাধ কতটুকু। এই কুকুরদের মনিবগুলো বসে আছে ইসলামাবাদ শহরে—সেগুলোই আসল জন্তু। নিজের মনে হেসে উঠল সালামং আলি এই সময়। রাজধানীর নাম ইসলামাবাদ। ইসলামকে যারা বরবাদ করেছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে এবং যার ঝোপের আড়াল থেকে নিজেদের অর্থলালসা, কামলালসা, আয়েস আরামের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির রোলার নির্দয় গতি চালু রেখেছে, তারাই শুধু এমনকৌতুক বিতরণে সক্ষম। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে কী আশ্চর্য ভাবে না ঘটে। আজ যেখানে ইসলামাবাদ শহর গড়ে উঠছে তার নাম পাটোয়ার ভ্যালি। এই অধিত্যকা বিশ বছর আগে ডাকাতদের আস্তানা ছিল। বড় ডাকাতরা ছোটদের ভাগিয়ে দিলে। এদের তুলনায় যদিও তারা ছিল দেবদূত বা ফেরেস্টা। তারা একটা ছোটো গেরস্থ লুট করে ক্যান্ডি দিত। এরা একটি জাতির সম্পদ লুণ্ঠন নয় শুধু তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্তে হত্যা তাওবে মেতেছে, সেখানে বর্বরতার নাদির শাহ, চেঙ্গিজ খান, বা হিটলার দুন্ধপোষ্য শিশু। বাংলাদেশের অধিবাসীদের হাড়ের উপর ষোল শ' কোটি টাকার শহরের পত্তন। তারই প্রতিবাদের খেসারৎ দিচ্ছি নিজের জীবন যৌবন দিয়ে...। সালামং আলির মনে হ'ল মাথার ভেতর কি যেন সিদ্ধি ঘোঁট ঘোঁট পাকাচ্ছে।

আর ত' মাথা কোথাও রাখতে পারব না। এখনই হয়ত মুখ খুবড়ে পড়ব। কিছু ধরা দরকার। শূন্যতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উপায় পর্যন্ত নেই। আলো দাও, আমাকে একটু আলো দাও যেন বাংলার মুখ আমি দেখতে পাই আর একবার। আর একটি বার। এমন চীংকার ভেতরে নিষ্ক্রমণ-পথের জন্ত মাথা কুটছিল।

আর্তনাদ দ্বারা শত্রুকে অনুরোধ করব ?

সালামৎ আলি একটু ভাবতে পারলে হাজার যন্ত্রণার মধ্যেও। কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাদের জীবন তারা অত সহজে নিজের ইচ্ছার বশবর্তী হয় না। না, জন্তুর কাছে মানুষ কিছু চাইতে পারে—এ অস্বাভাবিক। মানুষের ইচ্ছা আদেশরূপে জন্তুর কাছে যায়। এখানে তেমন ব্যবস্থা যখন নেই, নিঃশব্দতাই পরম সঙ্গী।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

নিজের কাছে প্রশ্ন এবার সোজাসুজি করে বসে সালামৎ আলি। কিন্তু জবাবের জন্ত অপেক্ষা করে না। কারণ অনেক ছায়াছবি সে যেন চক্ষুসংলগ্ন ফেটির সমতলে দেখতে পায় ধেয়ে ধেয়ে আসছে, আছড়েপড়ছে, ভেঙে চুরমার, এবং আবার খণ্ড খণ্ড দিগ্বিদিক বেরিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুতবেগে, তখন সবই যেন অনুপ্রবাহ এবং স্রোতের মত তার অভিঘাত সামনে যা পড়ে টেনে নিয়ে যায়। হয়ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত সালামৎ আলি। কিন্তু কয়েকটি গুজরে-যাওয়া ঘটনার গুঞ্জরণ কানের কাছে শুধু শব্দমূর্তি রেখে গেল না, আবার ছবি হয়ে উঠল। সর্বপ্রাচীন ছায়াচিত্রের ধারায় নির্বাক।

সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে একটি সহপাঠিনী তার কাছে বেশ ঘন ঘন যাতায়াত করেছিল। সালামৎ আলি সহকর্মীর মর্যাদা দিয়েছিল তাকে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা যেখানে একমাত্র যোগ সেতু। তারপর ধাপে ধাপে বৃহত্তর সমাজ জগতের এলাকায় নিজের জায়গা

করে নিয়েছিল সালামং আলি। ফলে, কাজ অনেক বেশি। এ জেলা সে-জেলা, এ মহকুমা সে-মহকুমা ছোটোছুটি, পাটি'র কর্মী সম্মেলন ইত্যাদির চাকায় বাঁধা জীবনে ফরসুৎ ছিল না। মাত্র গত সপ্তাহে সহপাঠিনী তার কাছে খোলাখুলি হৃদয় উন্মোচন করেছিল পত্রযোগে। কাজের ভিড়ে সাক্ষাতের যো ছিল না। তার মধ্যে হঠাৎ দেশের উপর হানাদারদের হামলা-জনিত সঙ্কট। কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধবসে গেল। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাকিয়ে ফল্গু আনন্দের রেশ সহ মুহূর্তে হেসেছিল সালামং আলি। সাড়া-উন্মুখ নিজের হৃদয় আর দল মেলার স্রুয়োগ পেলে না। একটি মুখ তাকে আজ বারবার ব্যথিত করে এই ভেবে যে, সে প্রলয়কালের চূড়ায় আসীন, কিন্তু শেষ চীৎকার দেওয়ার সময় অতিবাহিত। ইথারে কোন বাণী কম্পন আর থাকবে না। বস্তু-পিণ্ডের সঙ্গে সেও জড়ে পরিণত হবে। হিমবাহ পাহাড়ী তরুণ সব ভেতরে গুড়িয়ে দিয়ে বরফ আবৃত করে চলে গেল কোন গিরিখাদে সমাহিত হতে।

এত অন্ধকার কেন পৃথিবী জুড়ে? আমাকে আলো দাও, অতি অস্পষ্ট আলো, যার কাছে জোনাকি মনে হবে প্রদীপ। শুধু নিমেষের জন্ত। বাংলার মুখ তার সাহায্যেই দেখা হয়ে যাবে। বুকের ছবি যত ক্ষীণ রশ্মিই হোক চোখের সামনে, দৃশ্যকাব্য রূপে গীত হয়ে উঠবে হাজার যাত্রার হিল্লোলিত স্পন্দনে। এক ফোটা আলো পাঠাও, হে মার্ত্তণ্ড দেব তোমার অন্তহীন তেজভাণ্ডার থেকে। এই তমসার অবসান ঘটুক। এক ফোটা আলো.....

চোখ তেড়ে কালো ফেটির মধ্যে তাকাতে গেলে সালামং আলির মনে হল, মস্তিষ্কের ভেতর কোথায় যেন কি ছিঁড়ে গেছে এবং তার পক্ষে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু যদি চোখ মেলে চাইতে পারত, অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু কে দেবে তাকে আলো ?

অনুরোধ করব শাস্ত্রীদের ? ঘৃণায় চোখ মুখ কুচকে এলেও অসহ্য লাগছিল সালামৎ আলির কাছে শারীরিক যন্ত্রণার ধাক্কা, যা পথে কতবার না অকারণ শাস্তি মারফৎ পুরস্কার পাওয়া। না, আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কী হবে যদি এতটুকু মেহেরবানী গ্রহণ করা যায় ? অতি সামান্য দয়া। একবার আমার চোখটা খুলে দাও। এই মিনতি কী জন্তুর কাছে পরাজয় স্বীকার ?

এই জবাবের পূর্বে সালামৎ আলির মৃত কুৎপিপাসার্ত, প্রহৃত গোটা দেহ জুড়ে এমন তাওব গুরু হল তার কোন খেয়ালই ছিল না যখন সে চীৎকার দিয়ে উঠল, এই সেপাহী, জারা মেহেরবানী—

—কিয়া মাংতা—?

—মেরা আঁখ কা পটি খোল দিজিয়ে।

—কিঁউ।.....

—তকলীফ কা ওয়াজেহ সে নিহি। মাঁই জারা ছনিয়াকে। দেখ্‌নে মাংতা।

থোড়া রোশনাই। কষ্টের জন্ত নয়। আমি ছনিয়াটা একটু দেখে নিতে চাই। একটু আলো।

—রোশনাই।—আচ্ছা—আফসার সে পুছে।

বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

আবার বুটের আওয়াজ নিকটবর্তী।

উছ' জবান দস্ত ঘোষণা করলে, “এই কয়েদী চলো। তোমকা রোশনাই মেলে উস্কা বন্দোবস্ত করে।” (তুমি আলো পাও তার বন্দোবস্ত করি।)”

—মেহেরবানী।

—মেরা সাথ আও। এই রশি পাকড়ো। বাঙালী কা বাচ্চা ইধার উধার করেগা তো পেট মে কিরীচ ঘুঁসা ছুঁগা।

বাংলাদেশ কথা কয়

—চালিয়ে।

বন্ধ চক্ষু সময় আন্দাজের বিশেষ বাগড়া। সালামৎ আলি ঠাউর করতে পারে না কতক্ষণ সময় গেল। তবে সে সহজে ধরে ফেলে, কোন দালানের এক বারান্দা থেকে আর এক বারান্দা, করিডর থেকে করিডরে, যেখানে সিঁড়ি—সুতরাং তলা—এক বা দুই বা তিন তলা পার হচ্ছে।

হয়ত দশ পনের মিনিট।

সালামৎ তার হৃদিস দিতে পারবে না, কিন্তু তার পায়ে কোন জড়তা ছিল না। প্রতীক্ষিত আশা যখন হাতে; কাছে আসে আসে, তখন দ্রুততার গুণ্ডা যে-কোন মানুষকে উদ্বিগ্ন ব্যস্ততায় কাবু করে ফেলে। সালামৎ আলি তার কোন ব্যতিক্রম নয়। সজীবতা ফিরে এসেছিল তার দুই পায়ে, যদিও লুঙির তলায় ঠিক হাঁটুর নীচে সাইকেল চেনের পটাপট আঘাতে শুধু লুঙি নয় চামড়া পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল দগদগে ঘায়ের পরিণতি সহ। ছালা ধরে বৈকি ওই সব জায়গায় চলাকালীন লুঙির ঘষড়ানির চোটে। সালামৎ আলি কিন্তু যেন সব যন্ত্রণার উর্ধ্বলোকবিহারী। আর একটু পরেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারপর আসন্ন নয় অবধারিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা। কারণ, এপর্যন্ত এমন জন্তুদের কবল থেকে কেউ আর ফিরে আসে নি, দান্তে বর্ণিত দোজখ দরজার সাইনবোর্ড এরা গোটা বাংলা-দেশের উপর টাঙিয়ে দিয়েছে। ‘সর্ব আশা পরিত্যাগ করিয়া আসিও যাহারা প্রবেশার্থী।’

—রোকো। সহসা শাস্ত্রী হেঁকে উঠল।

থামলে সালামৎ আলি।

একটা দরজা খোলার শব্দ। কিছু কিছু ফিসফাস রব।

সিপাই তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে, সালামৎ আলি তা পরিকার টের পায়। হাতে, হাওকাফ যথারীতি মজুদ।

—তোম রোশনাই মাংতা ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আব তোমরা ফেটি খোল্ দেতা।

ব্যাকুলতা সালামৎ আলির আঙুলগুলো মৃদু কাঁপিয়ে দিয়ে
গেল, যেন সকালের হাওয়া।

—আচ্ছা, আব রেডি হো যাও।

সিপাইয়ের কণ্ঠস্বর।

—ঠিক হায়।

খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলে সালামৎ আলি।

একটানে সালামৎ আলির চোখের ফেটি খুলে গেল। আগ্রহী
অধীর বন্ধ চক্ষুর ফেটি উন্মোচন মাত্র তার মনে হ'ল যেন জ্বলন্ত তীর
অক্ষিপটে এসে বিধল। মাথায় বেঁ। বেঁ। চক্কর অতি দ্রুত এবং
ক্রমশ বেগবর্ধিত হুঁশের বনিয়াদ ভেঙে খানখান করে ফেলছে।

মূর্খ বেদ-উপনিষদের ঋষিবৃন্দ, যাঁরা লিখেছিলেন, “অন্ধকার
থেকে আমাকে আলোরদিকে নিয়ে যাও, তমসোমা জ্যোতির্গময়।”

প্রায় অচেতন তবু একেবারে মুর্ছিত, চোয়ার থেকে মাটিতে
লুটিয়ে পড়ার আগে সালামৎ আলি চেতনার স্বাক্ষর পাঠ করে
ফেললে নিমেষেই। জায়গাটা টর্চার চেম্বার বা নির্যাতন কক্ষ।
স্থানীয় ভাষায় খোলাইখানা। তার মাথার উপর পাঁচশ পাওয়ারের
বালব জ্বলছে। যা হেঁকে হেঁকে বলছে—‘দুশমনের কাছ থেকে
করণা ভিক্ষা করো না ; হয় তাদের ধ্বংস করো অথবা স্বংস হও।’

রোদের অন্তরকারে বৃষ্টি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগুনের লকলকে শিখাটাও ক্রমে নিভে যাচ্ছে। লাল আলোয় উদ্ভাসিত অরণ্যশীর্ষ আবার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে আকাশের নীচে একটা জমাট কালো পাহাড়ের মাথা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ, সোরগোল এসব কিছুই এখন নেই। আত্ননাদও নয়। একটা নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে লায়লি। ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা। শিবানী বলেছিল, ওটা বন্দুকের শব্দ। শিবানীর ভাই নরহরি বলেছিল, দূর বোকা, ওটা বন্দুকের শব্দ নয়। বন্দুকের শব্দ হয় গুড়ুম গুড়ুম। সেবার মেঘনার চরে বালিহাঁস মারতে গিয়ে বন্দুক ছুড়েছিলাম, তোর মনে নেই? লায়লি বলেছিল, শব্দটা তাহলে কিসের?

লায়লির ভাই জাকারিয়া, সংক্ষেপে জ্যাক এক সময় ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিল। সে বলল, সাব মেশিনগান, মর্টারের শব্দও শুনছি মাঝে মাঝে মাঝে। এ ছাড়া পাহাড় কাঁপানো যে শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে, তা খুব শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভের। ওগুলো দিয়ে আগুন লাগানো খুব সুবিধে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দেওয়া যায়।

ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছিল সবাই। পচা ডোবাটার একহাঁটু কাঁপা। এতক্ষণ ব্যাঙের ডাক শোনা যায় নি, হঠাৎ ঐকতান শুরু

হল। শিবানী বলল, দাদা এবার টর্চটা জ্বালাও। আমার পায়ের কাছে কি যেন একটা সরসর করছে।

লায়লি বলল, চুপ, মিলিটারিরা এখনো চলে যায় নি।

শিবানী হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করল, আহ্।

জ্যাক বলল, কি হল শিবানী?

আমার পা ক্রমেই কাদায় সঁদিয়ে যাচ্ছে। আর পায়ের কাছে কি যেন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা.....

নরহরি জামার খুঁটে চাপা দিয়ে টর্চ জ্বালল। আলোটা যেন বেশি দূরে না যায়। একটা সাপ সরসরিয়ে সকলের গা ছুঁয়ে ছুটে পালাল।

নরহরি বলল, কুইক, সকলে উপরে ওঠো।

নরহরি লায়লিকে একটা হ্যাঁচকা টানে উপরে তুলে দিল।

শিবানী কাতর স্বরে বলল, আমার একটা হাত ধরো দাদা। কাদা থেকে পা টেনে তুলতে পারছি না।

নরহরি তাকেও টেনে তুলল।

জ্যাক বলল, টর্চটা জ্বালো নরহরিদা, শিবানীকে সাপে কেটেছে কিনা দেখি।

আবার আলো জ্বলে উঠল। ডোবার কাছেই বাঁশঝাড়। আলোর তাড়ায় একটা কাঠবেড়ালি ছুটে পালাল। বাঁশঝাড়ে শো শো শব্দ হল। এপ্রিল মাসের বাতাস। এখনো গরম পড়ে নি। একটা ঠাণ্ডা হিমহিম ভাব। জ্যাক আলতোভাবে শিবানীর একটা পা তুলে ধরল। আলতা রাঙানো পা। ফর্সা পায়ে কাদা লেগে আলতার রঙ চুনসুঁকির মত লাগছে। যেন পলেস্তারা খসা সাদা দেয়ালে চুনসুঁকির দাগ। জ্যাক শিহরিত হল না। অথচ ঐ সাদা তুলতুলে পায়ের দিকে কতদিন সে অধীর হয়ে থাকিয়েছে।

জ্যাক আনমনা আরেকটা পা তুলে ধরল। শিবানীর মুখে রা নেই।

বাংলাদেশ কথা কয়

অন্যদিন অন্যসময় হলে সে বাধা দিত । সঙ্কোচে দূরে সরে বসিত ।
আজ পরম আশ্বাসে জ্যাকের কোলে পা তুলে সে বাঁশবাড়ের
দিকে চেয়ে রইল পুতুলের মত ।

নাহু সাপে কাটে নি । কোথাও বিষ-ব্যথা নেই তো !

না । শিবানী মাথা নাড়ল । তারপরেই আবার কঁকিয়ে কেঁদে
উঠল, মা, আমার মা ।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে পড়ল সকলের । পাশেই পাটক্ষেতে আশ্রয়
নিয়েছে নরহরির বাবা মা আর গ্রামের একদল নরনারী । জ্যাকের
বাবা মা ঘর ছেড়ে আসেন নি । লতিফ সাহেব বলেছেন, আমি
মুসলিম লীগের পুরনো লোক । ফ্রন্টিয়ারের গণভোটে লীগের
ভলান্টিয়ার হয়ে গেছিলাম । কায়েদে আজমের সার্টিফিকেট আছে
আমার কাছে । আমার ভয় কি ?

নরহরির বাবা রাখহরিবাবুর কানে কানে বলেছিলেন, ঘরে তিন
শো মণ ধান আছে । মালমত্তা কম নেই । এসব ছেড়ে কই যাব ।
মিলিটারি আসার আগেই চোর বাটপাড়ে লুট করে নেবে ।
আপনারা যান, তাড়াতাড়ি পালান । সোমন্ত মেয়ে দুটোকে সঙ্গে
নিয়ে যান । ছেলে দুটোকেও । ভয় তো ওদেরই ।

সেই ট্যা-ট্যা শব্দটা তখন আরো কাছে চলে এসেছিল । হঠাৎ
আগুনের হুঙ্কার উঠেছিল আকাশের পূর্ব কোণে । লতিফ সাহেবের
বাড়ি থেকে গ্রামের বাজার মাইল দুই দূরে । লতিফ সাহেব ভারি
গলায় বলেছিলেন, বাজারে আগুন দিচ্ছে । আমার আড়তটাও
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ।

শিবানী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে । তার শাড়িতে গায়ে চোখে মুখে
ছোপ ছোপ কাদা । লায়লির চুলে কাদার ছিটে । জ্যাক তার
কনুই থেকে কাদা মুছে নাক ঝেড়ে বলল, চল, চল, পা চালিয়ে
চল । মিলিটারির চলে গেছে ।

নরহরি টচ'টা নিভিয়ে দিল। বলল, বলা যায় না, কোথাও হয়তো
ওৎ পেতে রয়েছে।

জ্যাক বলল, আমি সামনে। শিবানী ও লায়লী মাঝখানে। নরহরিদা
পেছনে। কুইক মাচ'।

ঝরা পাতায় পায়ের শব্দ জগল না। ক'দিন ধরে পাতলা পাতলা
বৃষ্টি হচ্ছে। মওসুমের শুরুতেই এবার বৃষ্টি। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে
গেল পাটক্লেতের দিকে।

চাপ চাপ অন্ধকার গা সওয়া হয়ে আসে। সারা বিরিন্দি গ্রামটা
মনে হয় পরিত্যক্ত শ্মশান। আগে ঢুলিপাড়া থেকে মাঝে মাঝে
টোলের শব্দ ভেসে আসত। এখন তাও নীরব। জ্যাক বলল,
হাতঘড়িটা আনি নি। এখন রাত ক'টা?

লায়লি বলল, দশটার কম নয়।

এং, বলিস কি? আমরা তাহলে তিনঘণ্টা ওই ডোবাটায় ছিলাম?
তা হবে। নরহরি বলল।

তা হলে এশার নামাজের আজান শুনি নি কেন?

নরহরি জ্যাককে ধমকে উঠল, দূর বোকা! আজান দেবে কে?
মসজিদে লোক আছে নাকি!

জ্যাকের মনে হল, সে যুগ যুগান্তর ধরে হাঁটছে। এই হাঁটা শুরু
হয়ে ছিল কবে। না, সেই ছাব্বিশে মাচ' রাত্রে। হস্টেল থেকে
পালিয়ে এসে উঠেছিল বন্ধুর বাসায়। সেখান থেকে হেঁটে কুমিল্লা।
মাঝপথে নদী পার হয়েছে নৌকায়। তারপর নিজের গ্রামে।
হিসেব করে দেখছে, একদিনে চৌদ্দ মাইল হেঁটেছে। একটা তাড়া
খাওয়া জন্তুর মত সে পালিয়ে এসেছে। পরনে লুঙ্গি। গায়ে
ময়লা হাওয়াই সার্ট। গালে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লায়লি
দেখে প্রথমে চিনতে পারে নি, চীৎকার করে উঠেছিল, কে,
কে তুমি?

বাংলাদেশ কথা কর

জ্যাক বোনের চীৎকারে বিহ্বল হয় নি। সে বিহ্বল হয়েছিল দূরে বাজারের দিকে পতাকা উড়তে দেখে। এখনো পতাকা উড়ছে। সবুজ, লাল আর সোনালী রঙের তেরঙা পতাকা। হঠাৎ চোখ ছলছল করে উঠেছিল জ্যাকের।

হন্ট! পাটকেত নড়ে উঠল।

ছুটো বন্দুকের নল বেরিয়ে এল।

নিশ্চয়ই মিলিটারি। শিবানী শক্ত হাতে জ্যাকের একটা কাঁধ চেপে ধরল। জ্যাক এই প্রথম তার কাঁধে মৃত শিরশিরানির মত একটা ভয়ের তাড়া অনুভব করল।

বাতাসটা বড় ভারী। আকাশটা একটা বন্ধ ডালা কফিনের মত। অনেক উচ্চ থেকে নেমে এসে সেই কফিনটা যেন চেপে বসছে চার জনের কাঁধে। তারার আলো মোমবাতির মত জ্বলছে। যেন পথ দেখিয়ে দিচ্ছে শবাধারবাহী চার জনকে। কিন্তু আর এগোবার উপায় নেই। জ্যাক থমকে দাঁড়াল। অভ্যস্ত নিয়মে ছুটো হাত মাথার উপরে তুলল। দেখাদেখি শিবানী, লায়লি এবং নরহরি। ক্যাডেট কলেজে থাকতে এই নিয়মটা শিখে নিয়েছিল জ্যাক।

প্রথমেই বন্দুক হাতে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে জ্যাক অবাক। বাজারের বন্দুকসি দরজির বড় ছেলে। বথে যাওয়া ছেলে। ইস্কুলের গেষ দরজা পেরোয় নি। গত বছরই একটা ডাকাতির মামলায় দুমাস জেল খেটে এসেছে। লোহার পাইপ কিনে গাদা বন্দুক বানায়। লাইসেন্স ছাড়া বন্দুক রাখার অপরাধে একবার ধরা পড়তে গিয়েও বেঁচে গিয়েছিল।

জ্যাকের ভয় আরো বাড়ল। মিলিটারি নয়, এবার ডাকাত। দরজি নন্দন রহমতকে সে চেনে। খুন জখম রাহাজানি এই তিনটাতেই সে

সিদ্ধহস্ত। গ্রামের মেয়েদের দিকেও তার কুংসিত নজর। একবার শিবানীর কাছে সে উড়ো চিঠি দিয়েছিল। রাখহরিবাবু ভয়ে কিছু বলেন নি? শত হোক তিনি সংখ্যালঘু। তাছাড়া টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ। সুযোগ বুঝে রহমত একবার চিঠি লিখে দশ হাজার টাকা দাবি করেছিল। লিখেছিল, নইলে তার বাড়িতে ডাকাতি হবে। রাখহরিবাবু কাউকে কথাটা জানান নি। কারণ, তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে থানার ও. সি. মোবারক খাঁর যোগসাজস রয়েছে। রাখহরিবাবুর আগে কৃষ্ণগালের বাড়িতে ডাকাতি হয়। লুট হয়েছিল বন্ধকি গহনার সিন্দুক। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনা। অপরাধীরা কোনদিন ধরা পড়ে নি। যদিও গ্রামের অনেকেই জানত, এই ডাকাতির সঙ্গে রহমতের দলের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। রাখহরিবাবু সব বুঝে গোপনে রহমতকে ডেকে পাঁচ হাজার টাকায় রক্ষা করেছিলেন। জ্যাক ব্যাপারটা জেনেছিল নরহরির কাছ থেকে।

সেই রহমত এখন বন্দুকহাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে। জ্যাক নিরস্ত্র। তার পেছনে লায়লি এবং শিবানী। এর চাইতে মিলিটারিদের হাতে পড়াও বুঝি ভাল ছিল।

একটা শক্তিশালী টর্চের আলো জ্যাকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। রহমতের পেছন থেকে কেউ টর্চ মেরেছে। রহমত ধমকে উঠল, এই আলোটা নিভিয়ে ফেল্ আলিজান্।

আলিজান মানে থানার ও. সি. মোবারক খাঁর ছেলে। সেও এই দলে জুটেছে। এতক্ষণে রহমতের হাতে গাদা বন্দুক নয়, একেবারে বিলিতি বন্দুকের রহস্য উদ্ঘাটিত হল জ্যাকের কাছে। এগুলো নিশ্চয়ই থানার বন্দুক। দেশে এখন আইনকানুন নেই, থানা-পুলিশ নেই। সুতরাং একদিকে রাজস্ব হানাদার মিলিটারিদের, অন্যদিকে চোর ডাকাতের। জ্যাক মনে মনে দুঃখ করল, নিরস্ত্র হয়ে এসে কি ভুলটাই না করেছে। ঘরে যে-বন্দুকটায় মরচে ধরে আছে, সেটাও

বাংলাদেশ কথা কয়

এই দুঃসময়ে কাজে লাগত। তবু—কপালে যা থাকে। নিজের দেহে প্রাণ থাকতে শিবানী আর লায়লির গায়ে হাত তুলতে দেবে না সে কাউকে। রহমত, কি চাও তুমি? জ্যাক রুদ্ধশ্বাসে বলল। তার গলার স্বর বুঝি একটু কেঁপে গেল।

কিছু চাই না। পাহারা দিচ্ছি। মিলিটারির ভয়ে সবাই এই পাট ক্ষেতে পালিয়েছে। কিন্তু তোমরা কি চাও?

আমরা কি চাই মানে? জ্যাকের গলায় সাহস ফিরে এল।

এই ছোটো ভরখোঁবন মেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? রহমতের গলায় সন্দেহ আর বিদ্বেষের একটা কুৎসিত চটক।

কোথায় গিয়েছিলাম মানে?

মানে খুব সহজ। রহমত সহজ গলায় বলল, মিলিটারিদের ভেট দিতে গিয়েছিলে নাকি?

ক্রোধে সেই অন্ধকার পাট ক্ষেত আরো অন্ধকার হয়ে এল জ্যাকের চোখে। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে বলল, তুমি একটা জোচ্ছোর, ডাকাত। তার ওপর হাতে বন্দুক পেয়েছ। তাই একথা বলতে সাহস করছ।

রহমত চাপা কণ্ঠে হাসল, আমি ডাকাত। মুসলিম লীগার নই।

জ্যাক চাপা রাগে ফেটে পড়ল, তুমি একটা লোফার, লাম্পট।

মেয়েদের সম্মান রেখে চলতে জান না।

রহমতের হাসি তীব্র ও তীক্ষ্ণ শিশের মত হয়ে উঠল, মেয়ে দেখলে কোন্ পুরুষের না শরীর টাটায়, কিন্তু মোল্লা মওদুদীর চ্যালাদের মত আমরা আদমখোর নই।

জ্যাক স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলল, আমি মুসলিম লীগার, মোল্লা মওদুদীর লোক?

রহমত বলল, তুমি কিনা জানি না, তোমার বাবা মুসলিম লীগার ছিলেন। এখন মাথায় গোল টুপি চাপিয়ে জামাতের মজলিসে যান।

আমি বন্দুক উঁচিয়ে ডাকাতি করি, তোমার বাবা ডাকাতি করে মাথায় টুপি চাপিয়ে।

ঝগড়াটা পাকতে যাচ্ছিল, নরহরি এগিয়ে এল, রহমত, আমিও মিলিটারির ভয়ে পালিয়েছিলাম। দেখছ না আমাদের সারা গায়ে কাদা। এখন বাবা মার খোঁজে এখানে এসেছি। তারা পাট ক্ষেতে এসেছিলেন।

আমার মা! আমার মা! শিবানী এতক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল।

হুঁহুটে বন্দুকের নল চোখের সামনে থেকে সরে গেল। রহমত বলল, গ্রামের অনেকেই এই পাটক্ষেতে আছেন। মিলিটারিরা এদিকে আসতে পারে ভেবে আমরা তিনজনে মাত্র পাহারা দিচ্ছি। বন্দুক বলতে তিনটা। বাকী বন্দুক নিয়ে কনেষ্টবলরা পালিয়েছে। তারা নাকি মুক্তিফৌজে যোগ দেবে। আমাদের অবস্থাটা একবার ভাব? তোমরা পাহারা দিচ্ছ? জ্যাকের গলার স্বরে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস! রহমত ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, কেন, তুমি ভাবছিলে বুঝি সুযোগ পেয়ে গ্রামের মানুষের ওপর চড়াও হয়েছি, তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠ করছি। আর তোমার সম্পর্কে আমরা কি ভাবছিলাম জানো? তোমার বাবা মাথায় টুপি চাপিয়ে মিলিটারিদের অভ্যর্থনা করতে গেছে। সঙ্গে তুমিও গেছ। সংবর্ধনা সেরে ওদের পথ, দেখিয়ে তোমরাই নিয়ে আসবে এখানে। তাই মিলিটারিদের সঙ্গে না পারি তোমাদের গুলী করে মারার জন্ত প্রস্তুত ছিলাম। নরহরি বলল, এটা ঝগড়া করার সময় নয় রহমত।

জ্যাক মাথা নামাল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার ভোলা উচিত নয় রহমত, আমিও বাঙালী।

রহমত হাতের বন্দুক মাটিতে রাখল, বলল, তাহলে আমাকে ডাকাত, লম্পট বলছো কেন, আমিও তো বাঙালী।

বাংলাদেশ কথা কয়

রোদের আলোয় উঠোন উদ্ভাসিত। করমচা গাছের পাতা ঝরেছে প্রচুর। পেছনে আম গাছের পাতায় এপ্রিলের বাতাসের শির-শিরানি। ভোরের রোদ একটানা রকেল গাছের ছায়ায় আড়াআড়ি করে শুইয়ে দিয়েছে প্রশস্ত উঠোনটায়। একটা চিলের ছায়া সেই গাছের ছায়াটাকে ঘিরে ঘুরছে। বিরিন্দি গ্রামের আকাশটা আজ ভারী নীল। সূর্য একটা নীল পাতে মোড়া বিরাট চক্রে গড়াগড়ি খাচ্ছে। উঠোনটাই অনেক লোক। কিন্তু গমগমানি নেই। ওই নারকেল গাছের ছায়াটার মতই সবাই যেন ছায়া। চিলটা মাথায় উড়ছে; কখন ছোঁ মেরে নেমে আসে, সেই ভয়ে যেন ছায়াগুলো শিহরিত। কিন্তু নিঃশব্দ।

একটানা দমবন্ধ করা নৈঃশব্দ ভাঙলেন প্রথম রাখহরিবাবুই, মিলিটারির বাজার পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ঘাঁটি গেড়েছে পাঁচমাইল দূরে। রহমতের দল ষে-খবর এনেছে তাতে মনে হয়, আজ বা কালই গ্রামে ঢুকবে দল বেঁধে। কালকের মত ফিরে যাবে না। এই অস্থায়ী আমরা কি করব, কি আমাদের কর্তব্য, তুমিই বল লতিফ। তুমিই এই গ্রামের মাথা। মাতব্বর ব্যক্তিও। তোমার পরামর্শই আমাদের মানা উচিত।

জ্যাকের বাবা লতিফ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বললে নিজের মান আর কথার দাম দুটোই বাড়ে। গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার কথা কি আপনারা শুনবেন? তাহলে ছোকরাদের কথায় কান দেওয়া উচিত হবে না। এত শক্তিশালী মিলিটারিকে বাধা দিয়ে আমরা পারব না। ওদের আমরা বাধা দেব না। তার চেয়ে চলুন ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে বলি, আমরা আপনাদের অল্পগত প্রজা। পাকিস্তানের ফ্লাগ উড়িয়ে দি ঘরে ঘরে। তারপর ছাগল বকরি মেরে ওদের ঘটা করে খাইয়ে বিদায় দি।' রহমত একপাশে দাঁড়িয়ে লতিফ সাহেবের কথা শুনেছিল, বলল,

তাহলেই মিলিটারিরা অত্যাচার না করে চলে যাবে আপনি মনে করেন ?

লতিফ সাহেব বললেন, আমি তাই মনে করি।

মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে না ?

না।

হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হবে না ?

আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব, এই গ্রামের হিন্দুরা সাক্ষাৎ পাকিস্তানী। জ্যাক মৃদুস্বরে বলল, বাবা, তুমি কি বলছ, ওরা হিন্দুদের, আওয়ামী লীগারদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ ? ওদের রাগ সব বাঙালীদের ওপর। আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে আসার সময় দেখেছি, ওরা হিন্দু-মুসলমান, দোষী, নির্দোষী বাছে নি। যাকে সামনে পেয়েছে হত্যা করেছে, মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে।

লতিফ সাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসলেন, তুই-যা দেখেছিস তাও ঠিক, আমি যা বলছি তাও ঠিক। তোরা শহরে বসে ঘুমন্ত বাঘকে খুঁচিয়েছিস, বাঘ রেগে গিয়ে তুলকালাম করবে না ? কিন্তু গ্রামের মানুষদের ওপর ওদের রাগ নেই। থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ওরা রাগবে, যদি এসে ওরা দেখে গ্রামের ঘরে ঘরে এখনো স্বাধীন বাংলার ফ্লাগ উড়ছে। তাই আমি বলি, যুদ্ধ করে যখন পারবে না, তখন বুঝা রক্তপাতে লাভ কি ?

উঠোনে নারকেল গাছের ছায়াটা তখন আরো লম্বা হয়ে উঠেছে। একদল কাক জটলা করছে একটা পাকুড় গাছের ডালে বসে। রোদের হলদে লাল আভায় উদ্ভাসিত উঠানের সবগুলো মুখে কেমন এক অসহায় সন্ত্রাস চাউনি। শীতের বিহানে রোদ আর কুয়াশা মাখা অস্পষ্ট চেহারা মনে হয় সবগুলো মানুষকে জ্বাকের কাছে। এমন কি নিজের বাবাকেও। কেবল বন্দুকসী দর্জির ছেলে

নষ্ট স্বভাবের রহমত উত্তরমুখো ঘরের ভিটিতে পা ঠেকিয়ে একটা বাঁকা তলোয়ারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লতিফ সাহেব তার দিকে তাকালেন, আমার মত আমি বললাম, তোমরা কি বলো ?

উঠোনের অনেকগুলো মাথা একসঙ্গে নড়ে উঠল, আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করেন। আপনি আমাদের বাঁচান।

রহমত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, আমি এখনো মনে করি, শিশু মেয়ে আর বুড়োদের নিয়ে আপনারা এ গ্রাম থেকে সরে যান। মিলিটারি আজ রাতে এখানে আসবেই। আমরা তাদের সঙ্গে পারব না জানি। তবু লড়াই করে মেরে মরব। আর যদি বাঁচতে পারি, মুক্তিফৌজের গোপন ঘাঁটি গড়ব।

তুমি মুক্তিফৌজের লোক নাকি ? লতিফ সাহেবেয় কণ্ঠে ঠাট্টা আর তাম্বিল্য গোপন রইল না।

কেন, মুক্তিফৌজে যেতে পারি না ? রহমতের চোখ আর কণ্ঠ এক সঙ্গে হিংস্র হয়ে উঠল।

উঠোনের সমবেত লোকগুলোর মুখে নিজের প্রতি সমর্থনে ছায়া আরও গাঢ় দেখতে পেলেন লতিফ সাহেব। এপ্রিলের রোদ তেতে উঠতে শুরু করেছে। বললেন, তুমি নিজের কথা একেবারেই ভুলে গেছ রহমত। দেশে থানা পুলিশ আইন-কানুন থাকলে তুমি এমন প্রকাশ্যে এসে গাঁয়ের মাথাওয়ালা লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারতে, না গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্তু হুমকি দিতে পারতে !

আমি হুমকি দিই নি, আপনাদের ভালোর জন্তু বলছি। রহমত আশ্চর্য ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ গলায় বলল।

আমাদের ভালোর জন্তু বলছ ? লতিফ সাহেব উঠোনের লোকগুলোর মুখের দিকে আবার তাকালেন। তাঁর প্রতি সমর্থন ও আশ্বাস সেই ছায়াটাও দেখলেন বাড়ছে। গলার স্বর আরো

চড়িয়ে বললেন, ভুলে যাচ্ছে কেন, তুমি জেলখাটা দাগী আসামী। তোমার হাতে গ্রাম ছেড়ে আমরা চলে যাই, আর তুমি, সব লুটপাট করে সটকে পড়ো! তাই না?

রহমত কথা বলল না। তার ছায়াটা নারকেল গাছের ছায়ার মত আরো অকম্প স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জ্যাক বাবাকে বাধা দিল, কাল রাতে ও-ই পাটক্ষেতে সবাইকে পাহারা দিয়েছে বাবা। ওর সঙ্গে আরো ক'জন ছিল।

লতিফ সাহেব ধমকে উঠলেন, বিড়ালের কাছে ভাজা মাছ পাহারা! কে ওকে পাহারায় বসিয়েছিল রাতে? গ্রামের মেয়েরা ওর পাহারায় নিরাশদ নাকি! বলেই শিবানীর বাবা রাখহরিবাবুর দিকে তেরছা চোখে তাকালেন তিনি।

নারকেল পাতায় হঠাৎ বাতাস লেগে আন্দোলিত হওয়ার মত এক সঙ্গে অনেকগুলো মাথা আন্দোলিত হল, একটা সূসূ চাপা অস্পষ্ট আওয়াজ গড়িয়ে গেল। লতিফ সাহেব আদেশ দানের ভঙ্গীতে হাত ওঠালেন, আপনারা সকলেই নিজ নিজ ঘরে পাকিস্তানী ফ্লাগ উড়িয়ে দিন। শান্ত হয়ে ঘরে থাকুন। মিলিটারি এলে আমিই সকলের আগে যাব তাদের কাছে। আপনাদের কারো ভয় নেই। কিন্তু তার আগে আমার কথা মত কাজ করতে হবে।

রহমতের দিকে তাকালেন লতিফ সাহেব, আর তুমি এবং তোমার দলের কাছে আমার কথা তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। তোমরা গ্রামে থাকলেই আমাদের বিপদ। মুক্তিবাহিনীর লোক ভেবে মিলিটারি তোমাদের মারতে গিয়ে সারা গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে তোমরা বরং গ্রাম ছেড়ে চলে যাও।

বেশ, তাই হবে।

এমন নিরুত্তাপ নিরুত্তেজিত ভাবে রহমতকে কখনো চলে যেতে দেখে নি জ্যাক। রহমতের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার লম্বমান আড়াআড়ি

বাংলাদেশ কথা কয়

ছায়াটাও চলে যাচ্ছে। পিঠে বাঁধা রাইফেলটার অস্তিত্ব যেন ভুলে গেছে রহমত। শত হোক একটা অর্ধশিক্ষিত ছিঁচকে ডাকাত, ওর মরাল কারেজ আর কতটুকু হবে, ভাবল জ্যাক।

রোদের ছায়াটা তখন শান্ত হয়ে তার হলদে আঁচল গুটিয়ে নিয়েছে গাছের মগডালে। ঘাসের বুকে, পুকুরের পানিতে, শিবানীদের বাড়ির উঠানে বৃষ্টির আগে জমাট মেঘের মত ঘন ছায়া। জ্যাককে যেন বাঘে তাড়া করেছে, এমন ভাবে ছুটতে ছুটতে এল সে শিবানীর কাছে। শিবানী দেখল, জ্যাককে একজন বয়স্ক প্রৌঢ় মানুষের মত লাগছে। ভয় পেলে প্রৌঢ় মানুষেরা যা করে, মনের ভাব লুকিয়ে আরো সাহসী হতে চায়, জ্যাকের চেহারায় সেই বুড়োমির ছাপ। শিবানী বলল, দাদা নেই বাড়িতে। বাজারে গেছে। বাবার সঙ্গে গোলার চাল—যা বেঁচেছে সরিয়ে আনতে।

জ্যাক বলল, আমি কেবল নরহরির কাছে আসি নি। তোমার কাছেও এগেছি।

কেন? শিবানীর চোখের তারা ছুঁটো যেন স্থির হয়ে বিঁধে গেল জ্যাকের চোখে।

আজ রাত্রে কি তোমরা বাড়ীতে থাকতে চাও।

আর কোথায় থাকবো?

আমি বলছিলাম, তুমি আর খুড়িমা দু'জনেই আমাদের বাড়িতে থাকলে ভাল হত! আজ রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেলেই ভাল।

জ্যাকের চোখ থেকে শিবানীর চোখ সরে গেল যেন আকাশ থেকে উল্কাপিণ্ড হঠাৎ খসে গেল। মৃদু ফুলকি যেন ছড়িয়ে পড়ল শিবানীর চোখ থেকে জ্যাকের সারা গায়ে, তুমি দাদাকে কথাটা বল, কিংবা

বাবাকে। ঠাৱা যা ভালো মনে করেন। তবে বাবাকে রেখে মা
আমার সঙ্গে যাবেন মনে হয় না!

তাহলে তুমি লায়লির সঙ্গে থাকবে।

তা না হয় হবে, কিন্তু জ্যাক ভাই?

জ্যাকের মনে হল আরেকটা উদ্ধাপিও খসবে। শিবানী বলল,—
তোমার কি মনে হয় পাকিস্তানী ফ্লাগ ওড়াবার পরও কিছু হবে?
শহরে এবং অনেক গ্রামে হয়েছে। পাঞ্জাবী মিলিটারিদের
বিশ্বাস নেই।

ওরা কি চায়? শিবানীর গলাটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। জ্যাক চোখ
তুলল। উদ্ধাপিও খসার আগেই নিভে গেল।

একদল হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়েকে দেড় হাজার মাইল দূরে এসে
খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা উপোসী, বন্য এবং বর্বর।
আর ওদেরকে বলা হয়েছে, ওদের বর্বরতা অধর্ম নয়, বরং ধর্ম
রক্ষার জন্য। তুমি বুঝতে পারছো না এরপর ওরা কি চায়?

জ্যাক ভাই! বহুদূর থেকে একটা তরল ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত শব্দ
এসে যেন ভেঙে পড়ল জ্যাকের কানে। চেয়ে দেখল শিবানী
কাঁদছে না। কেমন কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইমাত্র শিবানী
এখানে ছিল রক্তমাংসর মানুষ। এখন যেন সে কাঁঠখোদাই মূর্তি।
নরহরি এসে দেখল ছ'জনকে। দু'টি অপলক চোখ মূর্তি। কাঁঠ-
খোদাই নয়। মাটি কেটে এইমাত্র যেন ছাঁদ তৈরী। বলল, কি
হল তোমাদের?

জ্যাক আর শিবানী আবার মানুষ হল। জ্যাক বলল, কি, গুদামে
কিছু পেলো?

না, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আজ রাত্রে কি করবে ভেবেছ, এখানেই থাকবে, না আমাদের
বাড়িতে?

বাংলাদেশ কথা কয়

নরহরি মাথা ঝাঁকাল, না। বাবা বললেন বাড়িতেই থাকবেন।
পাকিস্তানী ফ্লাগ উড়িয়ে দিয়েছি, ভয় কি? তোমার বাবা তো
তা-ই বললেন। তাছাড়া ঘরে মালপত্র তো কম নেই। সব ফেলে
রেখে তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠব, মুসলিম লীগের গুণ্ডারা সব
লুণ্ঠ করে নেবে।

জ্যাক বলল, তা ঠিক। কিন্তু শিবানী আর খুড়িমা, তারাও কি
বাড়ি থাকবেন?

নরহরি বলল, মা থাকবেন। শিবানী বরং যাক। লায়লির সঙ্গে
গিয়ে থাক।

জ্যাক ঘুরে দাঁড়াল, আমি মাকে গিয়ে বলি। শিবানী তুমি বেলা
থাকতেই বরং চলে এস।

ছুঁপা এগিয়ে জ্যাক থেমে গেল। নরহরির দিকে চেয়ে বলল,
নরহরি, আমার যেন কেন মনে হচ্ছে, আমরা রহমতের দলেই
যোগ দিলে ঠিক করতাম।

নরহরি নয়, শিবানী দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে গেল। নরহরি
কথা বলল না। তার চোখ অচল টাকার মত ঘষা এবং অস্পষ্ট।

সেই রাতটা গেল। পরের দিনটাও। কোথাও মিলিটারির আনা-
গোনা নেই। বাড়ি হলে বাতাসে বেগ না থাক, আকাশ তো থমথমে
হবে, তাও নয়। ওই-যে একদিন বিরিন্দি বাজার পুড়ল, স্টেনগান
আর মর্টারের আওয়াজ, ওই পর্যন্তই যেন সব। লতিফ সাহেব
বাজারে আধপোড়া চায়ের স্টলে বসে সকলকে বললেন, আমার
পরামর্শের ফল ছাখো। ফ্লাগ ওড়াতেই সব ভয় ঠাণ্ডা। আর ভয়
নেই। কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে, ওই রহমতের দলের যেন কেউ
ফিরে না আসে গ্রামে। তাহলেই বিপদ।

সেদিনটাও গেল। ইস্কুলের মাঠটায় বুড়ো অশথের অনেক পাতা ঝরল মাটিতে। কেউ কুড়িয়ে নেবার নেই। না ছাত্র, না শিক্ষক। সোমবারে বাজারের হাট। বসল না। কেউ এল না। কেবল নারকেল, সুশারী গাছের মাথায় বিবর্ণ চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্লাগ উড়তে লাগল।

রাতের লায়লির পাশে শুয়ে শিবানী ফিসফিসিয়ে বলল, ওরা বোধ হয় গ্রামের আর ফিরবে না?

ওরা কারা?

ওই যারা থানা থেকে বন্দুক লুট করেছিল। চাচার কথায় গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

রহমতের নামটা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না শিবানী। লায়লি টের পেল।

কেন আসবে? গ্রামের লোক ওদের ভাল চোখে দেখে না। ওরা টের পেয়েছে।

শিবানী বালিশে মুখ গুঁজে বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তোর কি মনে হয়?

গ্রামের লোক মিলিটারির ভয়ে ওদের গ্রাম ছাড়তে বলেছে। আসলে মনে মনে ওদের সমর্থন করে!

লায়লি হাসল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কেন বল তো?

রহমত একটা খারাপ ছেলে। ওর নাম শুনেও আগে ঘৃণা হত। কিন্তু সেদিন ওর কথা শুনে খুব খারাপ লাগে নি রে। রাইফেল কাঁধে ওকে মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি মুক্তিক্ষৌজ?

শিবানী মূহু স্বরে বলল, আমার একজন মুক্তিক্ষৌজ দেখার ভারী শখ। লায়লি হাসল নিঃশব্দ। হু'জনেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। সেই রাতেই ঘুম ভাঙল অদ্ভুত একটা আওয়াজে। অন্ধকারে সেই

বাংলাদেশ কথা কয়

শব্দের বিভীষিকা ভয়ঙ্কর। ঘুম ভেঙে শিবানী কিছুক্ষণ চারিদিকের
অস্পষ্ট অন্ধকার পরিবেশকে অনুভব করার চেষ্টা করল। লায়লির
তখন ঘুম ভেঙেছে। — বলল, কি হয়েছে ?

লায়লি কাঁপা গলায় বলল, বুঝতে পারছি না। হয়তো মিলিটারি
এসেছে।

মি-লি-টা-রি! চারটি শব্দ শিবানীকে নীরব করে দেওয়ার জন্য
যথেষ্ট। হঠাৎ লকলকে আগুনে পরস্পরের মুখ দেখতে পেল তারা।
প্রথমে কালো ধোঁয়া। তারপরই সবেগে আগুনের লেলিহান
শিখা উড়ল আকাশে।

আমাদের বাড়ি, আমাদের বাড়ির দিকে আগুন। শিবানীর কণ্ঠে
আর্ত অস্ফুট চীৎকার।

লায়লি কাঁঠ হয়ে রইল। একটি কথাও বলল না। চারিদিকে
শব্দ, আগুন, চীৎকার ও অন্ধকার মিলে মিশে ছ'টি মানুষ যেন
সব উপলব্ধির বাইরে চলে গেল।

ভোর হল। আগুন সব অন্ধকার পুড়িয়ে পূবের আকাশটাকে
ফর্সা করে দিয়ে গেল। গত রাতের অন্ধকারেই যেন পুড়ে ছাই
হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা গ্রামে। পালিয়ে যারা বাঁশ বনে পাট-
ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা মরেছে। যারা পালায় নি, তারাও
মরেছে। যারা বেঁচে আছে, ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছে। দ্বিতীয়
বার মৃত্যুর থাবার জন্মে তৈরী হয়ে রয়েছে।

মাকে দেখে চমকে উঠল শিবানী। খয়েরী পাড় শাড়ী পরনে মার।
মাথায় সিঁছর নেই। বাবার কথা মনে করে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায়
শিবানী ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল। পেছনে বাবাকে দেখে উচ্ছ-
সিত কান্না থামাল। বাবার পরনে লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া, মাথায়
টুপি। লতিফ চাচার মত গোল করে কাটা টুপি।

ভয়ঙ্কর বিবরণ। সেই বিবরণ বাবা শিবানীকে শোনালেন আস্তে

আস্বে। থানার বাড়িতে মিলিটারি উঠেছে। বড় দারোগা মোবারক মিয়ান লাশ বুলছে এখন থানার বুড়ো বট গাছে। এক গুলিতেই ফুটো হয়ে গেছে তাঁর কলজে। আওয়ামী লীগের নেতা সোবহান মিয়া বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তার ছোট ছ'ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। অন্তঃসত্ত্বা বৌকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারিরা। অন্তত দশটি হিন্দু পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। সতীশ কবরেজের অমন সুন্দরী মেয়ে এবার স্কুল ফাইনাল দিল, তাকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি ক্যাম্প। আর বাড়ি-যে কত পুড়েছে তার হিসেব নেই। শিবানীদের বাড়ি পুড়ে গেছে। লতিফ মিয়ান বাড়ি অবশ্য বেঁচেছে। গোলা ঘর পুড়ে গেছে। শিবানীর মার কপালের সিঁহুর মুছে, বাবাকে লুঙ্গি আর টুপি পরিয়ে মিলিটারির কাছে মুসলমান পরিচয় দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন লতিফ মিয়া। শিবানীর মা মাথায় সিঁহুর মুছতে চায় নি। তার গালে রাখহরিবাবুর প্রচণ্ড চড় কালশিরা হয়ে ফুটে রয়েছে।

সব কথা শেষ করে শিবানীর বাবা বললেন, আমরা ঠিক করেছি মুসলমান হয়ে যাব মা। তুইও মুসলমান হবি।

শিবানীর মা ফিস্ফিসিয়ে বলল, বড়ার পেরিয়ে পালানো যায় না? শিবানী বলল, মুসলমান হলেই কি বাঁচব বাবা, ওরা তো বাঙালী মুসলমানও মারছে।

রাখহরিবাবু বললেন, মারছে। তবে এখন আর মারবে না বলছে। তবে হিন্দু হয়ে আর বাঁচা যাবে না। গ্রামের মৌলবী কাসেম, জামাতে ইসলামীর নেতা। উনি বলেছেন, হিন্দুরা মুসলমান হয়ে জামাতের মেম্বর হলে আর তাদের ভয় নেই।

শিবানীর মা আবার ফিস্ফিসিয়ে বললেন, বড়ার পেরুনো যায় না। রাখহরিবাবু হঠাৎ গজ্জ' উঠলেন- না, যায় না। গেলে ওই সোমন্ত মেয়ে নিয়ে এখানে বসে মুসলমান হই ভাবছো!

বাংলাদেশ কথা কয়

শিবানীর ধর্মকর্মে কোনদিনই মতি নেই। আজ হঠাৎ মুসলমান হতে হবে শুনে তার চোখে কেন কে জানে দর দর করে অশ্রু নেমে এল। রাখহরিবাবু বললেন, কাঁদিস নে। সারাজীবন রক্ষাকালীর পূজা করেছে। কই তিনি তো বিপদে রক্ষা করতে এলেন না। অমন মাটির পুতুলের ধর্মের কথা ভেবে কি লাভ মা?

শিবানী চোখ মুছল। বুঝল, এটা বাবার অভিমান ও রাগের কথা। ভোরের রোদ চিক চিক করল তার ভেজা চোখে। বলল, লতিফ চাচা বলেছিলেন, পাকিস্তানী ফ্লাগ ওড়ালেই আমরা বাঁচব। কই বাঁচলাম না তো। এখন তুমি বলচ, মুসলমান হলে বাঁচব। তিনিও কি তাই বলছেন?

রাখহরিবাবু শ্রান হাসলেন, তোর লতিফ চাচার কোন দোষ নেই মা। তিনি আমাদের বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট করছেন। এখন দেখছেন উপায় নেই। উপায় নেই দেখেই বলছেন, রাখহরি, বপালে যখন ছিল—মুসলমানই হয়ে যাও। আর তো উপায় দেখছি না। তাছাড়া তোমাদের শাস্ত্রেই বলে সব ধর্ম সমান। আমি বলতে চেয়েছিলাম সব ধর্ম সমান বটে, তবে আমাদের কাছে পরধর্ম ভয়াবহ। কিন্তু আর বলি নি।

শিবানী চোখ আবার কাপড়ে খুঁটে মুছল, না বলে ভালোই করেছে।

অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। কাদেম মৌলভীর বাড়ির প্রাঙ্গণেই জনা পঞ্চাশেক হিন্দু জমায়েত হয়েছে। শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতীর ভিড়। দু'জন পাঞ্জাবী সেপাই রাইফেলের বাটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। দীক্ষাপত্র হাতে কাসেম মৌলভী দাঁড়িয়ে। তার চোখে সগর্ব উল্লাস। আজ এই কজন হিন্দু নর-নারীকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবেন তিনি। ঘন ঘন দাড়ি নেড়ে কলেমা পাঠ করছিলেন। তাঁর দলের পাঁচজন যুবক কর্মী, পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, হাতে লাঠি নিয়ে পাশে

দাঁড়িয়ে। লতিফ সাহেব গম্ভীর মুখে ঘাসে রুমাল বিছিয়ে বসে
আছেন। প্রথমেই কলেমা পাঠ করে ধর্মান্তরিত হলেন রাখহরি।
নতুন নাম হল, আল্লারাখা। শিবানীর মা কাঁদতে কাঁদতে ছুঁহ
আরবী উচ্চারণের কলেমা পাঠ করলেন, না কেবল বিড় বিড় করলেন
কিছুই বোঝা গেল না। ঘোমটা-মুক্ত শিবানীর দিকে চেয়ে হঠাৎ
কাসেম মৌলভী কলেমা পড়তে ভুলে গেলেন। বললেন, তোমার
তো শাদী হয় নি না?

শিবানী নিরুত্তর। রাখহরি বললেন—না।

কাসেম মৌলভী অভ্যেসবশে দাড়িতে হাত বুলোলেন, তাহলে তো
কেবল মুসলমান হলে-এর চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে একজন
মুসলমানের সঙ্গে-এর শাদী দিয়ে দিতে হবে। তা না হলে ঈমান
কমজোর থেকে যাবে।

রাখহরি বিস্ময়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বললেন, বিয়ে? এখনই বিয়ে।
ওই যে ওর বড় ভাই নরহরি। ওরই এখনো বিয়ে হয় নি।

কাসেম মৌলভী হাসলেন, ব্যাটাছেলের কথা আলাদা।

কিন্তু এখন ওর পাত্র পাবো কোথায়?

কাসেম মৌলভী অভয় দিলেন, আপনাকে ভাবতে হবে না। পবিত্র
দীন ইসলামের কোলে যখন আপনার মেয়ে ঠাঁই নিচ্ছে, তখন ওর
পাত্রের অভাব হবে না। ওই-যে দেখছেন রুস্তম গাজিকে।
জামাতের নিষ্ঠাবান কর্মী। বাজারে চায়ের দোকান আছে।
লেখাপড়া জানে না। তাতে কি! ঈমান বড় মজবুত। আপনার
মেয়ে সুখে থাকবে।

লতিফ সাহেব যেন বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিনমিনে গলায়
বললেন, আপনি কি বলছেন মৌলভী ভাই। আরে শিবানী যে
স্কুল ফাইনাল পাশ। রুস্তম ক'অফর জানে না। তার ওপর
রুস্তমের বয়স হবে দ্বিগুণ।

বাংলাদেশ কথা কয়

কাসেম মৌলভী হাসলেন, আপনি কেবল বয়স আর লেখাপড়াটাই দেখলেন, ওর ঈমানের জোরটা দেখলেন না। দশমাইল দূর থেকে মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে এই গ্রামে কে এনেছে? ওই রুস্তম গাজি। শিবানীর ওপর গ্রামের কারো দাবি থাকলে ওর দাবিই তাই প্রথম। লতিফ সাহেব ঢোক গিলে বললেন, দা-বি? হ্যাঁ, দাবি! বলেই কাসেম মৌলভী হাঁক পাড়লেন, কই রুস্তম, এদিকে এগিয়ে এস।

কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। খুতনি বের করা একটা সরু ছুঁচলো মুখ। নাকের ফানা বড়। চোখ ছোট। কালো, কর্কশ একটা মুখ লুপ্তিতে নাক ঝেড়ে এগিয়ে গেল।

শিবানী একবার তার দিকে অপাঙ্গে তাকাল। তারপরই একটা অস্ফুট গোঙানির মত শব্দ বেরুল তার মুখ থেকে—মা-মা-গো। রাখহরিবাবু হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, না, না, না। আমি মুসলমান হই নি। হব না।

রাখহরিবাবুর চীৎকারের রেশ তখনো চারদিকে যেন ঢেউ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিবানীর মা মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন। কেবল শিবানীরই শোক নেই। সব শোক আর সহের উর্ধ্ব শিবানী যেন এইমাত্র একটা ঝরাপাতা হয়ে মাটিতে শেষ শয্যানিতে নেমে যাচ্ছে। তার যোগ নেই। না গাছের সঙ্গে, না মাটির সঙ্গে। ঝরা পাতার মতই তার কোন অনুভূতি নেই।

কিন্তু তখনই কানে বাজল একটা শব্দ। নাকে এল বারুদের গন্ধ। কেউ রাইফেলের ট্রিগার টিপল বুঝি। মানুষের অস্তিম আত্ননাদও এমন স করুণ হয়!

লতিফ সাহেবের গলা শোনা গেল, এ কি জ্যাক, এ কি রহমত তুমি? সৈন্ত ছুঁটোকে তোমরাই মারলে? এ কি—এ কি আবার রাইফেল তুলছে?

চকিতে শিবানী মাথা তুলল। হ্যাঁ, জ্যাক এবং রহমত, আরো হুঁচারজন। কাসেম মৌলভীর ভারী শরীরটাকেও সে ছুগড়ে মুচড়ে মাটিতে পড়তে দেখল। লতিফ সাহেব তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শিবানীকে, শিবানীর বাবা ও মাকে জ্যাকই দ্রুত টেনে দাঁড় করাল। বলল, কুইক শিবানী, এখনই পালাতে হবে। মিলিটারিরা খবর পেয়ে যাবে এই অপারেশনের। এখনই আমাদের ঘিরে ফেলবে। তার আগেই পালাই চল।

রাখহরিবাবু শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কোথায় পালাব? আর আমি—আমি-যে মুসলমান।

রহমত চীৎকার করে উঠল—কে বলছে আপনি মুসলমান। জোর করে মুসলমান করলেই মুসলমান হয় নাকি। যারা এভাবে অশ্রুকে মুসলমান করে, তারা নিজেরাও মুসলমান নয়, শয়তান। জ্যাক তাড়া দিল, আহু, বক্তৃতা নয়, পালাও।

নরহরি বলল, আর তুমি?

জ্যাক বলল, আমিও পালাব। তবে এখন নয়। সেকেণ্ড অপারেশনের পর। আরো ছ'টো দালাল খতম করে। কুইক রহমত, কুইক শিবানী। জ্যাক ও তার দলবল দ্রুত পেছনে মিলিয়ে গেল। সামনে শিবানীর বাবা ও মা, পেছনে নরহরি। তারও পেছনে শিবানী ও রহমত। রহমত বলল, ওই-যে সামনে বন। ঐ বনে গিয়ে লুকোতে হবে। তারপর রাত্রে নদীতে গিয়ে ছোট নৌকা করে চেপ্টা করে দেখতে হবে ত্রিপুরা বর্ডারে যাওয়া যাবে কিনা।

শিবানী ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছিল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল রহমত, কি হল শিবানী।

শিবানী সেই নির্জন বনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে কেঁদে উঠল, রুস্তম গাজিকে দেখেও যে-কান্না সে কাঁদে নি সেই কান্না,—

বাংলাদেশ কথা কয়

আমি যাব না, কিছুতে যাব না, কিছুতেই আমাকে তোমরা নিয়ে
যেতে পারবে না।

শিবানী নিজেই দেখল, তার চোখের পানি বৃষ্টি ফোঁটার মত বড়,
স্বচ্ছ এবং নির্ভার।

বেশ কাছ থেকেই আবার তার কানে রাইফেলের শব্দ ভেসে এল।
এবার একটা নয়, অনেক এবং একটানা।



